শিল্পকথা

শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

। ১৩৫০ ।

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জনদ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়]চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ খুদা

। ১৩৫১ ।

১৯. রায়তের কথা : প্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

পরবর্তী বর্ষে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শিল্পকথা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

প্রকাশ কার্তিক ১৩৫১
পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৫৭

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন। বীরভূম

শিল্পগুরু আচার্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও শিল্পবন্ধুদিগকে

উৎসর্গীকৃত

শিল্পসাধনার পথে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও বয়ঃকনিষ্ঠ শিল্পীবন্ধু ও শিল্পরসিকদের সহিত আলাপ-আলোচনা ও মনের কথার আদান-প্রদানই এই লেখাগুলির প্রেরণা। বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে লেখা হইয়াছিল বলিয়া স্থানে স্থানে পুনরুক্তি হইয়াছে; আশা করি, সুধীগণ সে ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

গ্রন্থকার



ব্রোন্‌জ্ পুতুল : ক্রীট দ্বীপ

সূচীপত্র

চিত্রপরিচয়

রেখাচিত্রগুলি গ্রন্থকার কর্তৃক অঙ্কিত।

২৩ পৃষ্ঠার চিত্র একখানি মিশরীয় শোকচিত্রের অনুকরণ। ২৪ পৃষ্ঠার দুইটি চিত্রে উহার বিশ্লেষণ দেখানো হইয়াছে।

৩০ পৃষ্ঠার চিত্র একটি সিংহলীয় কারুকর্মের অনুকরণ।

২৪ পৃষ্ঠার অন্যতম চিত্রটি উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে প্রাপ্ত হায়েনা-পুতুলের।

ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেব শিল্পানি।
এতেষাং বৈ শিল্পানামণুকৃতিরিহ
শিল্পমধিগম্যতে।

আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।
ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান
আত্মানং সংস্কুরুতে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ



১। বুদ্ধমূর্তি। ছান্দসিক : স্বগত ছন্দে



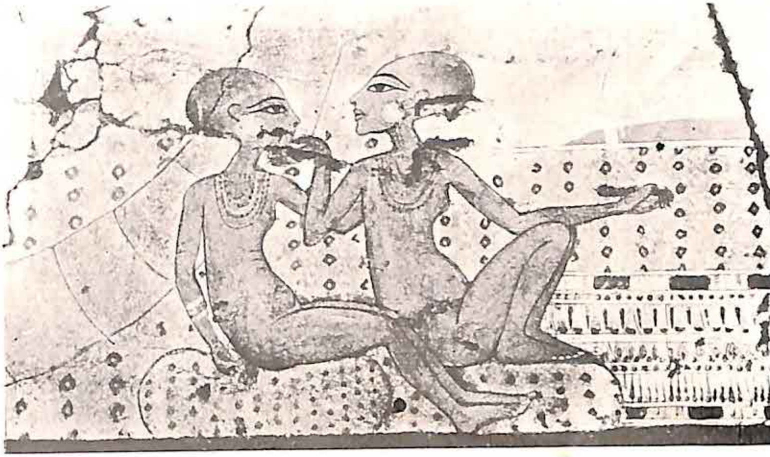
২। নটরাজ। ছান্দসিক : স্বগত ছন্দে



৩। মিশরীয়
ব্যঞ্জক
উনকৃত



৪। গ্রীকো-রোমান
অনুকারক



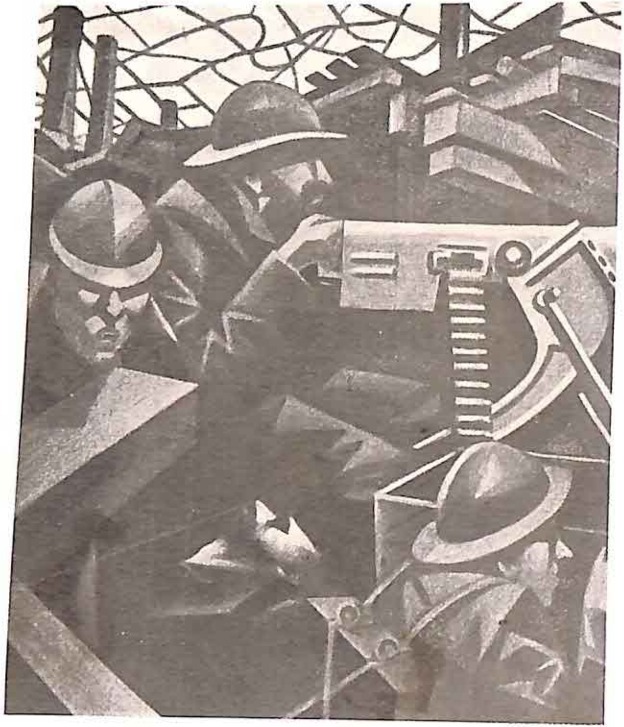


৫। মিশরীয় ভিত্তিচিত্র
ব্যঞ্জক : উনকৃত

৬। অজন্তাগুহার চিত্র
ছান্দসিক
শ্রেণীগত ছন্দে



৭। য়ুরোপীয়। অনুকারক



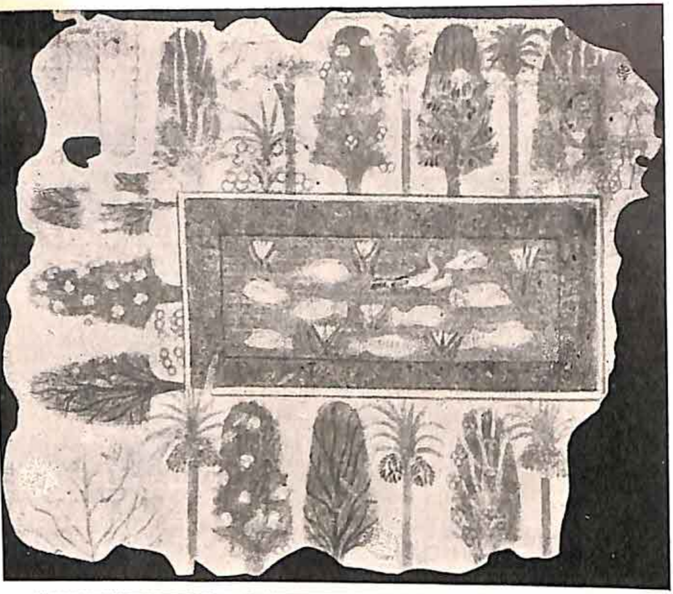
৮। য়ুরোপীয়। ছান্দসিক : শ্রেণীগত ছন্দে



৯ চীনা ০ ব্যঞ্জক ০ উন্নত



১০। জাপানি। ব্যঞ্জক





১১। মিশরীয় ভিত্তিচিত্র। ছান্দসিক : শ্রেণীগত ছন্দে
১২। বিলেতি ছুঁচের কাজ। অলংকরণ : সাধারণ ছন্দে

ভূমিকা

আমি সাহিত্যিক নই। ভাষার শিল্প আমার জানা নেই। সুতরাং, ব্যাখ্যা করে কিছু বলব, আমার সে শক্তি নেই।

আজকে পৃথিবীতে যে দুর্দৈব দেখা দিয়েছে তার কারণ মানুষের দেহবুদ্ধির ও স্বার্থবুদ্ধির প্রবলতা। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উপায়ে তার সাময়িক যে প্রতিকারই সম্ভব হোক, স্থায়ী ও গভীর প্রতিকার হল— কেবল প্রাণধারণ ও স্বার্থসাধন এই উভয়ের অতীত যদি কোনো প্রেরণা মানুষের থাকে তারই অনুশীলন, তারই সাধনা।

সাহিত্য ও শিল্প সেই জাতের জিনিস। মানুষের চিত্তবৃত্তির সংস্কার এতে হয়; ব্যষ্টির ও সমষ্টির জীবনে ছন্দ সুর ও সামঞ্জস্য তার দান।

আজকের দিনেই সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, দেশব্যাপী যখন এত দুঃখ, পৃথিবী-ব্যাপী যখন এত পাপ, সাহিত্য বা শিল্প -চর্চার সময় কোথা—তার ঔচিত্যই বা কোন্‌খানে। এ কথা ভুল। কারণ, সাহিত্য ও শিল্পের অনুশীলন তো বিলাস নয়, স্বপ্নপ্রয়াণ নয়, পলায়নপর মনোবৃত্তির ছল নয়। অবশ্য, সত্যদৃষ্টি নিয়ে আমরা যদি সাহিত্য ও শিল্পকে দেখি, তার চর্চা করি।

স্বার্থের ও অজ্ঞানের ঘনীভূত অন্ধকারেও আমরা অন্তঃকরণে যে আলোক দেখতে পাই সাহিত্য বা শিল্প তারই ছটা; তাতে বাইরের অন্ধকারও দূর হতে পারে, দুঃখ দূর না হোক দুঃখের কারণ দূর হতে পারে। আমাদের কেবল সচেতন সাধকোচিত মনোভাব প্রয়োজন, একাগ্রতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রয়োজন। ঠিকভাবে স্বধর্মের অনুসরণ করলেই সাহিত্যিক ও শিল্পীর পক্ষে সমাজের প্রতি তাঁদের যা কর্তব্য তা পালন করা হবে।

শিক্ষায় শিল্পের স্থান

মানুষ আনন্দ পাবার জন্য এবং জ্ঞান অনুশীলনের জন্য যত রকম উপায় উদ্ভাবন করেছে, তার মধ্যে ভাষা একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চা চলছে ভাষাকেই বাহন করে। সাহিত্য মানুষকে আনন্দ দেয়, কিন্তু তার প্রকাশের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তার সেই অভাব পূরণ করছে রূপশিল্প সংগীত নৃত্য ও অন্যান্য কলা। সাহিত্যের যেমন একটা নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আছে তেমনি রূপশিল্প সংগীত নৃত্যেরও আছে। মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে, বহির্জগতের সকল বস্তুর তত্ত্ববোধ ও রসবোধ করে এবং শিল্পে তা অপরের কাছে প্রকাশ করে; শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পের চর্চার দ্বারা মানুষের তত্ত্ববোধ ও রসবোধের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং শিল্পের প্রকাশভঙ্গী আয়ত্ত হয়। চোখের কাজ যেমন কানের দ্বারা হয় না তেমনি ছবি গান ও নাচের শিক্ষা কেবল লেখাপড়ার দ্বারা সম্ভব নয়।

আমাদের শিক্ষাদানের আদর্শ যদি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদান হয়, কলাচর্চার স্থান এবং মান বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উচিত। এ দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এ দিক দিয়ে এ পর্যন্ত যা ব্যবস্থা হয়েছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এর কারণ আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, শিল্পচর্চা একদল পেশাদার শিল্পীরই একচেটিয়া কারবার, সাধারণের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। শিল্প না বোঝার জন্য অনেক শিক্ষিত লোকও অগৌরব বোধ করেন না—আর জনসাধারণের তো কথাই নেই, তারা ফোটো ও ছবির তফাত বোঝে না; জাপানি খোকা-পুতুলকে শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করে অবাক হয়ে থাকে; বিশ্রী-রঙ-করা লাল নীল বেগুনি জার্মান র‍্যাপার দেখতে চোখের পীড়া তো বোধ করেই না বরঞ্চ উপভোগ করেই থাকে; সহজপ্রাপ্য সস্তা মাটির কলসির বদলে প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে টিনের ক্যানেস্তা ব্যবহার করে। এর জন্য দায়ি দেশের শিক্ষিতসমাজ এবং প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়। আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যার

ক্ষেত্রে দেশবাসীর সংস্কৃতি যেমন বাড়ছে বলে মনে হয়, রসবোধের দৈন্যও তেমনি ক্রমশ পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। এর প্রতিকারের উপায় তথাকথিত শিক্ষিতসমাজে কলাশিক্ষার প্রচলন ব্যাপকভাবে করা; কারণ, এই শিক্ষিত-সমাজই জনসাধারণের আদর্শস্বরূপ।

সৌন্দর্যবোধের অভাবে মানুষ যে কেবল রসের ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয় তা নয়, তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌন্দর্যজ্ঞানের অভাবে যাঁরা বাড়ির উঠানে ও ঘরের মধ্যে জঞ্জাল জড়ো করে রাখেন, নিজের দেহের এবং পরিচ্ছদের ময়লা সাফ করেন না, ঘরের দেয়ালে পথে ঘাটে রেলগাড়িতে পানের পিক ও থুথু ফেলেন, তাঁরা যে কেবল নিজেদেরই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেন তা নয়—জাতির স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করেন। তাঁদের দ্বারা যেমন সমাজদেহে নানা রোগ সংক্রামিত হয় তেমনি তাঁদের কুৎসিত আচরণের কু-আদর্শও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা কলাচর্চায় বিলাসী ও ধনী ব্যক্তিরই একমাত্র অধিকার বলে তাকে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে অবজ্ঞাভরে নির্বাসিত করে রাখতে চান। তাঁরা ভুলে যান যে, সুষমাই শিল্পের প্রাণ, অর্থমূল্যে শিল্পবস্তুর বিচার চলে না। গরিব সাঁওতাল তার মাটির ঘরটি নিকিয়ে মুছে মাটির বাসন ও ছেঁড়া কাঁথা গুছিয়ে রাখে। আবার, কলেজে-পড়া অনেক শিক্ষিত ছেলে প্রাসাদোপম হোস্টেলের বা মেসের ঘরে দামি কাপড়-জামা তৈজসপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে জবড়জঙ্গ করে রাখে। এখানে দরিদ্র সাঁওতালের সৌন্দর্যবোধ তার জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত ও প্রাণবন্ত, ধনীসন্তানের সৌন্দর্যবোধ পোশাকি এবং প্রাণহীন। শিল্প-উপাসনার নামে ক্যালেণ্ডারের মেমসাহেবের ছবি ফ্রেমে বাঁধানো হয়ে শিক্ষিত লোকের ঘরে সত্যকার ভালো ছবির পাশে স্থান পেয়েছে, দেখতে পাই। ছাত্রমহলে দেখি, ছবির ফ্রেম থেকে জামা ঝুলছে—পড়ার টেবিলে চায়ের কাপ, আর্শি, চিরুনি ও কোকোর টিনে

কাগজের ফুল সাজানো। প্রসাধনে কাপড়ের উপর বুকখোলা কোট, শাড়ির সঙ্গে মেমসাহেবি ক্ষুরওলা জুতো—এরূপ সর্বত্রই সুষমার অভাব, আমাদের বিত্ত থাক আর না-থাক্, সৌন্দর্যবোধের দৈন্য সূচিত করে।

আবার আর-একদল লোক আছেন যাঁরা বলেন 'আর্ট করে কি পেট ভরবে।' এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভাষাচর্চার যেমন দুটো দিক আছে—একটা আনন্দ ও জ্ঞানের দিক, আর-একটা অর্থলাভের দিক, তেমনি শিল্পচর্চারও দুটো দিক আছে—একটা আনন্দ দেয়, আর-একটা অর্থ দেয়। এই দুটি ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প। চারুশিল্পের চর্চা আমাদের দৈনন্দিন দুঃখদ্বন্দ্বে-সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারুশিল্প আমাদের নিত্য-প্রয়োজনের জিনিসগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অর্থাগমেরও পথ করে দেয়। কারুশিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক দুর্গতির আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং, প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকে শিল্পকে বাদ দেওয়া জাতির অর্থাগমের দিক দিয়েও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

শিল্পশিক্ষার অভাবে যে আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা অসুন্দর করে তুলেছে তাই নয়, আমাদের অতীত যুগের রসস্রষ্টাদের স্বষ্ট সম্পদ থেকেও আমাদের বঞ্চিত করেছে। আমাদের চোখ তৈরি হয়নি, তাই দেশের অতীত গৌরব -স্বরূপ যে চিত্র ভাস্কর্য ও স্থাপত্য এতদিন আমাদের কাছে অবোধ্য ও অবজ্ঞাত ছিল, বিদেশ থেকে সমঝদার আসবার প্রয়োজন হল সেগুলি আবার আমাদের বুঝিয়ে দিতে। আধুনিক যুগের শিল্পসৃষ্টিও বিদেশের বাজারে যাচাই না হলে আমাদের দেশে আদৃত হয় না, এ আমাদের লজ্জার কথা।

এর প্রতিকারের সম্বন্ধে এইবার মোটামুটি ভাবে আলোচনা করা যাক। শিল্পশিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে—প্রকৃতিকে এবং ভালো ভালো শিল্পবস্তুকে শ্রদ্ধার সহিত দেখা, সে-সবের সঙ্গ করা এবং সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত

হয়েছে এমন লোকের সঙ্গে আলোচনা করে শিল্পকে বুঝতে চেষ্টা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য—প্রত্যেক স্কুলে ও কলেজে অন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষার স্থান রাখা, শিল্পকে পরীক্ষাগ্রহণকালে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গণ্য করা এবং প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের যাতে পরিচয় ঘটতে পারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা ও অবকাশ রাখা। অঙ্কনপদ্ধতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বাড়বে; ফলে তারা সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সত্যদৃষ্টি লাভ করবে। বিদ্যালয়ে কাব্যচর্চার ব্যবস্থা আছে কিন্তু কাব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করলেই কেউ বড়ো কবি হন না, তেমনি বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার আয়োজন থাকলেই যে সকল ছেলে শিল্পী হবে এবং ভালো শিল্প সৃষ্টি করতে পারবে, এমন আশা করা অবশ্য ভুল হবে।

প্রথমত ছেলেদের বিদ্যালয়ে, গ্রন্থাগারে, পড়ার ঘরে এবং বাসগৃহে কিছু কিছু ভালো ছবি মূর্তি এবং অন্যান্য চারু ও কারুশিল্পের নিদর্শন (অভাবে ঐ-সকলের ভালো ফোটো বা প্রতিচ্ছবি) সাজিয়ে রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ভালো ভালো শিল্পনিদর্শনের ছবি ও ইতিহাস -দেওয়া সহজ-বোধ্য ছেলেদের বই উপযুক্ত লোক দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখাতে হবে।

তৃতীয়ত, ছায়াচিত্রের সাহায্যে মাঝে মাঝে স্বদেশের ও বিদেশের বাছাইকরা ভালো ভালো শিল্পবস্তুর সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

চতুর্থত, মাঝে মাঝে উপযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে গিয়ে ছেলেরা নিকটস্থ যাদুঘর বা চিত্রশালায় অতীত শিল্পকীর্তির নিদর্শন দেখে আসবে। বিদ্যালয় থেকে ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাওয়ার ব্যবস্থা যখন হতে পারে তখন চিত্রশালা বা যাদুঘর দেখে আসাও অসম্ভব হবে না। এ কথা মনে রাখতে হবে—একটা ভালো শিল্পবস্তু নিজের চোখে দেখলে এবং বুঝলে শিল্পদৃষ্টি যতটা জাগ্রত হয়, একশোটা বক্তৃতা শুনলে তা হয় না।

ভালো ছবি, ভালো মূর্তি, ছোটোবেলা থেকে দেখতে দেখতে, কিছু বুঝে কিছু না-বুঝে ছেলেদের চোখ তৈরি হবে, পরে আপনা থেকেই তাদের শিল্পের ভালোমন্দ বিচার করবার শক্তি জন্মাবে এবং ক্রমশই সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হবে।

পঞ্চমত, প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের যোগসাধন করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করতে হবে। সেই আয়োজনের মধ্যে থাকবে সেই সেই ঋতুর ফুলফলের সংগ্রহ এবং শিল্পে ও কাব্যে সেই সেই ঋতু সম্বন্ধে যে-সমস্ত সুন্দর সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে ছেলেদের যতদূর সম্ভব পরিচয় ঘটাবার ব্যবস্থা।

ষষ্ঠত, প্রকৃতিতে যে ঋতু-উৎসব চলছে তার সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। শরতের ধানখেত ও পদ্মবন, বসন্তে পলাশ-শিমূলের মেলা, তারা যাতে নিজের চোখে দেখে আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে শহরবাসী ছেলেদের জন্য এ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক ; গ্রামের ছেলেদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেই চলবে। এই-সব ঋতু-উৎসবের জন্য বিশেষভাবে ছুটি দিয়ে বনভোজনের এবং ঋতু-উপযোগী বেশভূষা ও খেলা-ধুলার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে যোগসাধন একবার হলে, প্রকৃতিকে সত্যকার ভালোবাসতে শিখলে, ছেলেদের অন্তরে রসের উৎস আর কখনও শুকোবে না ; কারণ, প্রকৃতিই যুগে যুগে শিল্পীকে শিল্পসৃষ্টির উপাদান জুগিয়ে এসেছে।

শেষ কথা এই যে, বৎসরের কোনো-এক সময়ে বিদ্যালয়ে একটি শিল্পসৃষ্টির উৎসব করতে হবে। তাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কিছু না কিছু শিল্পবস্তু নিজের হাতে তৈরি করে এনে শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগ দেবে—তা সে শিল্পবস্তু যতই সামান্য হোক। ছেলেদের সৃষ্ট শিল্পবস্তুগুলি উৎসবের অর্ঘ্যরূপে সংগৃহীত হয়ে সাজানো থাকবে। নৃত্যগীত শোভাযাত্রা প্রভৃতির দ্বারা উৎসবটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলবার চেষ্টা করা দরকার। উৎসবের নির্দিষ্ট একটা

কালনির্ধারণ করা শক্ত, দেশভেদে সেটা বদলাবে। বাংলাদেশে শরৎকালই প্রশস্ত মনে হয়।

আমরা যতদূর জানি তাতে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ কলাচর্চাকে উপযুক্ত স্থান দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থায় তিনিও পদে পদে বাধা পেয়েছেন। কলাচর্চার স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে না থাকায় অভিভাবকগণ কলাচর্চাকে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ করেন ; ফলে যে-সমস্ত ছেলেদের ছোটোবেলায় নানা কলাবিদ্যার চর্চায় বিশেষ অনুরাগ দেখা গেছে তারাও প্রবেশিকা পরীক্ষার দু-এক বৎসর আগে থেকে কলাচর্চার অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে এবং তাদের শিল্পানুরাগ এই সময় থেকে কমতে কমতে অবশেষে একেবারেই তিরোহিত হয়। এ বিষয়ে আমাদের সকলপ্রকার-জ্ঞানচর্চার-কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অবহিত হবার সময় এসেছে।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলতে চাই। যে-সমস্ত সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক অপরিণত হাতের কাঁচা কাজ কোনো বিশেষ ধারার শিল্পের নাম করে বাজারে বার করেন তাঁদের রুচিহীনতার অন্য নিন্দা না করে কেবল এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, ভালো নূতন ছবি না পেলে তাঁরা বরং ভালো পুরাতন ছবি ছাপাবেন কিন্তু বন্ধুত্বের বা আত্মীয়তার খাতিরে লোককে ভ্রান্তপথে চালিয়ে অপরাধী হবেন না। চিত্রনির্বাচনে সমঝদার সৌন্দর্যবোধ-সম্পন্ন লোকের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হলে নিতে হবে ; কারণ, লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রসমূহের ভালো বা মন্দ প্রভাব বিস্তার করবার শক্তি সামান্য নয়।

মোটকথা, শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔদাসীন্য কমলেই শিল্পচর্চার প্রসার হবে এবং ফলে দেশবাসীর সৌন্দর্যবোধ এবং পর্যবেক্ষণশক্তি বাড়বে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শিল্পসাধনা

উপনিষদ বলে, আনন্দ থেকেই সমস্ত বিশ্বভুবনের উৎপত্তি হয়েছে। সেই আনন্দ সমস্ত সুখদুঃখ নিয়ে অথচ সুখদুঃখের অতীত। আর্টিস্টও সৃষ্টি করে সৃষ্টি করার আনন্দে। কোনো শিল্পবস্তু যথার্থ সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ল কি না তার বিচারও হয় ঐ থেকে। আনন্দ থেকে যদি কোনো-একটি চিত্র বা মূর্তির উদ্ভব হয়ে থাকে, অন্যকেও তা আনন্দের স্বাদ দেবে। প্রকৃত শিল্প-সৃষ্টি জীবন্ত, তার মৃত্যু নেই। যদি অজন্তা-ইলোরার সমস্ত চিত্র ও মূর্তি নষ্ট হয়ে যায়, আসলে তবুও তার নাশ নেই। কারণ, রসিকের চিত্তে তখনও তা অমর হয়ে থাকবে। যদি একজন আর্টিস্টও তা দেখে থাকে, তারই কাজের ভিতর তার প্রভাব, তার সত্তা কাজ করবে। অর্থাৎ, দাঁড়ালো এই যে, শিল্প যেহেতু সৃষ্টি সেহেতু তা জীবধর্মী। জীবেরই মতো তার অস্তিত্বের ধারা পুরুষানুক্রমে বয়ে চলে।...

অনেক কাল আগে আচার্য প্যাট্রিক গেডিস শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এসেছিলেন। তখন আমরা দেয়ালে ছবি আঁকবার চেষ্টা করছিলাম; ঠিকমতো উপকরণের অভাবে ও করণকৌশল ভালোরকম না জানাতে অল্প কাল পরে সে চেষ্টা ছেড়ে দিই। আচার্য গেডিস তা দেখে দুঃখিত হলেন। তিনি বললেন, 'আঁকবে না কেন? যদি কাঠকয়লা দিয়েও আঁক, আর সে ছবি ভালো হয়, যদি একজন লোকও তা দেখে, তাহলেই তোমার কাজ করা সার্থক হয়েছে। নিরুদ্যম হয়ে যদি বসে থাক, তোমার ভাব কল্পনা যা-কিছু তোমার ভিতর জেগে উঠে তোমাতেই লয় পাবে; তুমিও তা ভালো ক'রে জানবে না, অন্যেরও তা অগোচরে থাকবে।'...

সকল শিল্পের লক্ষ্য এক। কবিতা, মূর্তি, চিত্র, নাচ, গান, সবই সৃষ্টির মূল আনন্দের ছন্দকে আপন আপন ছন্দে ধরতে চায়। সে হিসাবে যোগ-

সাধনার সঙ্গে শিল্পসাধনার মিল আছে। অধ্যাত্মসাধনায় সৃষ্টির সমুদয় বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্য সন্ধান করা হয়—**একের** সন্ধান করা হয়, যাকে জানলে সব-কিছুকেই জানা যায়। শিল্পও ঠিক ঐ ভাবে বিরাট **একের** সন্দর্শন -মানসে চলেছে। এক চীনা আর্টিস্ট বলেছেন, 'দেবতার মূর্তি আর দূর্বার অঙ্কুর, যথার্থ আর্টিস্টের নিকট দুইয়ের একই মূল্য ; একই রসপ্রেরণা জাগাবার শক্তি দুজনে ধরে।' এতেই বোঝা যায়, শিল্পীর পক্ষে একের ধারণা করা কতখানি সম্ভব। অবশ্য, দেবমূর্তির প্রতি অশ্রদ্ধার কোনো কথা হচ্ছে না, কেবল দূর্বার অঙ্কুরের প্রতিও সমান শ্রদ্ধা প্রয়োজন।…

শিল্পসাধনায় শিল্পী সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে যায়। আর্টিস্টের নিজের ব্যক্তিগত আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার, সবই আছে। কিন্তু, এই মুহূর্তে সে একটি ভাবের আবেগে বিচলিত হচ্ছে আর পর মুহূর্তেই সৃষ্টি করতে বসে নিজের আবেগ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছে ; তখন বিষয়ে-বিজড়িত তার নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি থাকছে না, ব্যক্তিগত উপলব্ধির তীব্রতা নৈর্ব্যক্তিক রূপ ধরছে। সৃষ্টির সময় শিল্পী নিজের ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে চলে যায় এবং তার বিষয়ও আবেগ থেকে ইমোশন থেকে, রসে গিয়ে পৌঁছয়।

আর্টিস্ট হৃদয়বিদারক দৃশ্যও আঁকে, আবার মনোমুগ্ধকর বিষয়ের ছবিও করে। কিন্তু, উভয়ের কিছুতেই লিপ্ত বা বিচলিত হয় না। শিল্পী সুখকর বা দুঃখকর আবেষ্টনের ঊর্ধ্বে উঠে উভয়েরই মূলে সত্তার যে আনন্দ বা রস আছে তারই বিগ্রহ সৃষ্টি করে। রসের দিক থেকে সৃষ্টি করা না হলে, রসে না পৌঁছলে, রচনা বিকৃত হয়—সুখে বিকৃত, দুঃখে বিকৃত। কাজেই দেখা যায়, সাধকেরও যে ধারা শিল্পীরও তাই ; উভয়েই নিজের নিজের পথ ধ'রে লাভ করে সর্বগত এক বিশুদ্ধ আনন্দ। অন্য উপাসনা বা ব্রত আচার পালন না করলেও শিল্পী নিজের কলাকৌশলযোগেই সাধনা করে থাকে।…

একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। কালীমূর্তি বা নটরাজ শিবের মূর্তি যার

ধ্যানে প্রথম এসেছিল সে ব্যক্তি শিল্পী, সাধক হলেও সে শিল্পী; যার হাতে প্রথম আকার লাভ করেছিল সে ব্যক্তি শিল্পী হলেও সাধক। কারণ, দুজনেই একটি কোনো রসের ভিতর রঙ রূপ গতি ও ছন্দের বিগ্রহ বা সমষ্টিরূপ সৃষ্টি করেছে—অথবা বলা যাক, তা সৃষ্ট হয়েছে দুজনেরই মনে।...

সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে সুনীতি দুর্নীতির ভেদ টেনে আনা শিল্পের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। কারণ, সামাজিক সংস্কারে যা নিন্দনীয় তাই হয়তো শিল্পীকে রসবোধে উদ্বোধিত ক'রে এমন কিছু রচনা করাতে পারে যা শিল্প হিসাবে অন্য হাজার হাজার লোককে সংস্কারবদ্ধ খণ্ডিত ধারণার ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ রসোপলব্ধিতে নিয়ে যাবে। বিষয়বিশেষকে লোকে বলুক দুষ্ট কিন্তু মায়াবী তুলির স্পর্শে তাতে বিষয়াতীত এমন কিছু ফুটে উঠবে যা অভিনব। যে দেখে বা যে অনুভব করে সেই বিষয়ীর দৃষ্টিভঙ্গীর ইতর-বিশেষে ও চেতনার তারতম্যেই নির্ভর করে, বিষয়টি সুনীতি-দুর্নীতির স্তরেই থেকে যাবে, না তার ঊর্ধ্বে উঠবে। উপনিষদে তো আছে: আত্মার দ্বারাই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও মৈথুনের উপলব্ধি হয়; এ জগতে এমন কী আছে যা আত্মা জানে না।[১] সুতরাং বিষয়বিশেষে দোষ বা গুণ নেই। স্রষ্টা সততই যে বিশুদ্ধ আনন্দ বা রসের ভিতর দিয়ে জানেন শিল্পীও যদি সেই আনন্দ বা রসের ভিতর দিয়ে জানে, শিল্পীও যদি সেই আনন্দ বা রসের দৃষ্টিতেই বিষয়কে দেখে ও সৃষ্টি করে তা হলে বিষও অমৃতত্বের পরিচয় প্রদান করে। বিষয়বস্তুর মোহেই যে আর্টিস্ট ভোলে বিষয়বস্তুকে তার রসবস্তুতে পরিণত করা হয় না—বাহ্যবস্তু বা ঘটনাই পাওয়া যায়, রসের ভিতর মন

১ যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥
উপরে শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি অনুবাদ অনুযায়ী শ্লোকের বাংলা অর্থ দেওয়া হয়েছে।

বিস্তার বা মুক্তি পায় না। রোগের চেয়ে রোগীর প্রতি যখন ডাক্তারের নজর থাকে বেশি, আরোগ্য হয় দুর্লভ।

তবু আবার প্রশ্ন ওঠে, সামাজিক হিসাবে দুর্নীতিপূর্ণ যা তাকেই বিষয়-বস্তু করলে সমাজের কিছু কি অনিষ্ট হয় না। আমার বক্তব্য এই, শিল্পীর রচনা যেখানেই সার্থক হয়েছে সেখানেই আবেগ রসে পরিণত হয়েছে, খণ্ড উপলব্ধি একটি অখণ্ডের ছন্দে ধরা পড়েছে; তাতে শিল্পীও যেমন রসিক দর্শকও তেমনি খণ্ডিত বস্তু বা ঘটনা থেকে, মানসিক অভ্যাস ও সামাজিক সংস্কার থেকে, সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছে; অত্যন্ত গৌণভাবেও এর ফল হল সামাজিক শুভই, অশুভ নয়। অবশ্য, এমন রুগ্ন মন আছে, এমন অনেক বয়স্ক শিশুও দেখা যায়, যারা উপলক্ষ্যস্বরূপ জিনিসটিকেই দেখতে পায়, রসের আবেদন তাদের কাছে নিষ্ফল। এদের অপরিণত বা বিকৃত মতির উপযোগী করে শিল্পসৃষ্টি করা চলে না; বরং অন্যভাবে চেষ্টা করা ভালো, ক্রমে এদের বোধ, এদের দৃষ্টি, যাতে সুস্থ ও পরিণত হয়।···

কিছুকাল পূর্বে পুরী ও কোনারকের মন্দিরের বহির্ভিত্তিস্থিত বন্ধকাম মূর্তিগুলি[২] নষ্ট করবার কথা হয়েছিল। অত্যন্ত সাংঘাতিক প্রস্তাব! ঐগুলি গেলে শিল্পসৃষ্টির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই চলে যায়। নিশ্চয় করে বলতে পারি নে, পুরী ও কোনারকের ভাস্কর শিল্পী কেন এমন বিষয় নির্বাচন করেছিল। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। মানুষের জীবনে যে নবরসের লীলা এটি তার অন্যতম রস—আদি রস। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রসসৃষ্টি হিসাবে উক্ত মূর্তিগুলি খুবই উচ্চ শ্রেণীর।···

২ ঐগুলিকে দুর্নীতিপূর্ণ না ব'লে আদিরসাত্মক বলা উচিত। শিল্পবস্তুর শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নীতির দিক থেকে নয়, রসের দিক থেকে। রসের ব্যভিচার ঘটালেই শিল্পের পক্ষে তা 'দুর্নীতি'। রসের ব্যভিচার ঘটিয়ে 'শিল্প'কে সামাজিক সুনীতি-প্রচারেও লাগানো যায়; যথার্থ শিল্পসৃষ্টি তা নয়।

শিল্পীর চিত্তবৃত্তি ভিন্ন সময়ে ভিন্ন আবেগে দোলায়িত হয়। এমন দেখা যায়, একই শিল্পীর কোনো একটি রচনা থেকে রসিকের মনে দিব্যভাব জেগে উঠল, অন্য রচনা হল নিচু ধরনের। লোকে বিস্মিত হয়। কিন্তু, বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই ; পরিবেশের পরিবর্তনে, মানসিক অবস্থার পরিবর্তনে, একই শিল্পী ভিন্ন মানুষ হয়ে ওঠে। রস উপলব্ধি ক'রে, ছন্দের রহস্য জেনে, যে মুহূর্তে শিল্পী সৃষ্টি করে সে মুহূর্তে মানুষের লভ্য সব-চেয়ে উন্নত অবস্থাই তার আয়ত্তের মধ্যে ; কিন্তু সব সময়ে তা হয় না। ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে প'ড়ে মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রংশ ঘটে। সমস্ত জীবনই আনন্দের ছন্দে ছন্দোময় হবে, আসলে এটাই শিল্পীর সাধনা হলেও, সব সময়ে সিদ্ধ হয় না।…

অদ্বৈতের সাধনায় পরম উপলব্ধিতে পৌছতে হলে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করে উঠতে হয়। আর্টিস্টের আত্মবিকাশও হয় ঐ ভাবেই। কিন্তু, অদ্বৈতবাদী মনে করতে পারেন, সাধনার পথে যা-কিছু ছেড়ে যেতে হবে তা অনিত্য, তা তুচ্ছ ; তাই নিয়েই শিল্পসৃষ্টি করার অর্থ কী ? শিল্পীর উত্তর হল এই যে, শিল্পের সৃষ্টিই হচ্ছে মায়াকে আশ্রয় ক'রে। মায়া স্রষ্টাকে অভিভূত করে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপমাচ্ছলে বলেছেন, সাপের বিষ সাপকে লাগে না। শিল্পীও মায়াকে জেনে মায়ার ব্যবহার করেন ব'লেই তা হয়ে ওঠে লীলা। আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছই হোক আর উচ্চই হোক, অনিত্যই হোক আর নিত্যই হোক, সবের ভিতরে অনুস্যূত **একের** ঐক্যটিকে অনুভব করা ও প্রকাশ করাই শিল্পীর সাধনা, শিল্পীর সিদ্ধি। বিষয়ের মোহে পড়লেই ভয়ের কারণ। সেই হল মায়ার দাসত্ব। শিল্পী মায়াকে দেখে **একের** মধ্যে বিচিত্র ছন্দের দোলা রূপে।…

যে আর্টিস্টের সমতার বোধ ও সমগ্রতার বোধ হয় নি তারই বিশেষ বিষয় চাই, বিশেষ বেদনা চাই। তার অভাব হল তো তার প্রেরণার উৎস শুকিয়ে গেল ; কেননা, রসের চির-উৎসারের খোঁজ মেলে নি।…

হিন্দুঘরে জন্মে হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি। এক কালে বিশেষ ক'রে দেবদেবীর ছবিই এঁকেছি। এখন কিন্তু দেবতার ছবি যেমন আঁকি সাধারণ জীবনের ছবিও তেমনি এঁকে থাকি; উভয়েতেই সমান আনন্দ পেতে যত্ন করি। দেবতার রূপকল্পনাই উঁচু দরের জিনিস, আশপাশের সাধারণ জিনিসের রূপ তুচ্ছ—এই ধারণা পূর্বে ছিল। মনের পরিণতির সঙ্গে রূপকেই আর প্রধান করে দেখি নে; তাদের প্রত্যেকটিকে একই সত্তার বিভিন্ন ছন্দ ও বিগ্রহ হিসাবে দেখি। সমুদয় জগৎ, অন্তরে বাহিরে সকল রূপ, যে প্রাণ থেকে নিঃসৃত এবং যে প্রাণে স্পন্দমান[৩] সত্তার সেই প্রাণছন্দকেই খুঁজি সমস্ত রূপে—কী সাধারণ আর কী অসাধারণ। অর্থাৎ, পূর্বে দেবত্ব দেবতার রূপেই দেখতাম, এখন দেখতে যত্ন করি—মানুষে, গাছে, পাহাড়ে।

সব দেশে সব যুগে বড় আর্টের পিছনে বড় আদর্শ বা বড় আইডিয়া থাকে। যেমন য়ুরোপে ছিল খৃস্টের আদর্শ, ভারতে ছিল শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধের, চীনে তও। ব্যক্তিকে আইডিয়ার বিগ্রহরূপে পূজা করতে থাকলে, কালে আইডিয়া থেকে ব্যক্তি বড় হয়ে ওঠে; ক্রমে আইডিয়াকে মানুষ ভুল বোঝে বা ভুলে যায়; পারিপার্শ্বিক জীবনে অনুরাগরঞ্জিত চেতনার আলো পড়ে না, তা উপেক্ষিত হয়। আমাদের দেশে তাই হয়েছে। কালে কালে প্রকৃতির মধ্যেই সাধকেরা কালীমূর্তি শিবমূর্তি দেখেছে; আমরা সেই বিশাল প্রকৃতিকে দেখতেই ভুলে গেছি। ঈশা বাস্যমিদম্ সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ[৪]—উপনিষদের এই মন্ত্রের দীক্ষা নিয়ে ভারতের ভাবী শিল্পকলা সমস্ত জীবনকে আর সমস্ত জগৎকে সত্য দৃষ্টিতে দেখবে, নূতন করে সৃষ্টি করবে।

৩ যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। কঠ ২. ৩. ২. শ্লোক।

৪ ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকার্ধ। শ্রীঅরবিন্দকৃত অর্থ: জগতের অন্তরে যে-কিছু জগৎ পরমেশ্বরের আবাস-মন্দির ব'লে জানবে।

শিল্পপরিচয়

সাধারণতঃ আমরা তিন ধরনের ছবি দেখতে পাই— (১) অনুকারক (২) ব্যঞ্জক (৩) ছান্দসিক।

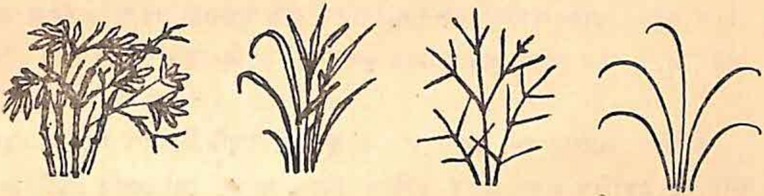
প্রথমে উল্লিখিত ছবিতে হুবহু নকল করবার চেষ্টা দেখা যায়। যখন ফোটোগ্রাফি ছিল না তখন হুবহু নকল করবার কৌশলটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। চিত্রশিল্পীরা যখনই চোখে-দেখা কোনো বস্তুর ছবি সমতল জমির উপর এঁকে ঐ ছবিতে সেই আসল বস্তুটির ভ্রম জন্মাবার চেষ্টা করলেন তখনই পরিপ্রেক্ষিত-বিজ্ঞান, বর্ণলেপবিজ্ঞান, জীবজন্তু ও মনুষ্যের দেহে অস্থি ও পেশী -সংস্থানের বিজ্ঞান এবং সূর্যরশ্মিবিজ্ঞান শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করল। ক্যামেরার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ পদ্ধতিতে আঁকা কমে এসেছে, কিন্তু পূর্বোক্ত বিজ্ঞানগুলি শিল্পীদের শেখবার বস্তু হয়ে রইল।

সংকেতে বা ঠারে-ঠোরে যে ছবি আঁকা হয় তাকে ব্যঞ্জক বা ব্যঞ্জনাপ্রধান ছবি বলা যায়। এ রকম ছবিতে কেবল চোখের দেখা রইল না, মনের দেখা এসে পড়ল। প্রকৃতিতে সব বস্তু চোখ মেলে দেখলেও দেখা সম্পূর্ণ হল না। আবার, মনের যোগে কোনো বস্তু দেখলেই, সেই বস্তু আঁকবার সময় শিল্পীর মনের যা অবস্থা তারই ছাপ অঙ্কিত রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইল। মন কোনো বস্তুকে অংশতঃ বা উনকৃত করে দেখে, কোনো বস্তুকে অতিকৃত করে দেখে। তাই এরূপ ব্যঞ্জনাপ্রধান ছবি কোনো বস্তুর হুবহু নকল হতেই পারে না। বস্তুর আসল রূপের সঙ্গে অঙ্কিত রূপের ইতরবিশেষ হবেই। এখানে মনে রাখতে হবে, এ রকম মনগড়া ব্যঞ্জনাপ্রধান ছবির সঙ্গে অপটু শিল্পীর ভুল-আঁকা ছবির আকাশ-পাতাল তফাত। কারণ, পটু শিল্পী শিল্পসৃষ্টিকৌশল ও শিল্পবিজ্ঞান সব জানা সত্ত্বেও দেখা রূপের সঙ্গে আঁকা রূপের তফাত করেন; এই তফাত কখনো তিনি না জেনে করেন, কখনো বা জেনে হুঁশিয়ার থেকেই করেন।

ছান্দসিক বলতে সেই ছবি বোঝা উচিত যে ছবিতে বিশেষ ক'রে ছন্দের উপরেই ঝোঁক থাকে। ছন্দকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়— (১) স্বগত ছন্দ (২) শ্রেণীগত ছন্দ (৩) সাধারণ ছন্দ।

বাঁশগাছ একটি নির্দিষ্ট গাছ, বাঁশগাছের স্বগতরূপ নিয়েই তার বিশেষত্ব ; সেজন্য বাঁশগাছে ও ঘাসে তফাত বোঝা যায়। এই হল স্বগত ছন্দ।

বাঁশগাছে ও ঘাসে সম্বন্ধ আছে। ও দুটি গাছ একই পর্যায়ের ; শাল বা সেগুনের থেকে যে অমিল তার তুলনায় ওদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ মিল আছে। সেজন্য ও দুটি আবার একই শ্রেণীগত ছন্দে বাঁধা।



কিন্তু, বাঁশগাছ আর ঘাস, এই দুটি বস্তু থেকে যদি ঐ ছন্দটি বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ব্যবহার করা যায় তবে বিশেষ করে বলা চলবে না যে, সেটা বাঁশগাছ কি ঘাস কি ফোয়ারা। কারণ, ফোয়ারার মতো উৎসারিত গতির রেখাগুলি ঐ কয়টা বস্তুরই সাধারণ ছন্দ।



তেমনি আবর্ত হল শঙ্খ, লতা, জল বা বাতাসের ঘূর্ণি প্রভৃতির সাধারণ ছন্দ। অলংকরণশিল্প সেই ধরনের কাজকেই বলে যাতে সাধারণ ছন্দেরই খেলা ; উদ্দেশ্য কেবল মণ্ডন বা শোভাসাধন। যেমন কার্পেট, নানারূপ জালিকাজ, আলপনা।

শ্রেণীগত ছন্দে প্রকৃতির একটি বস্তুর গড়ন রঙ বা গতির সঙ্গে আর-একটি বস্তুর গড়ন রঙ বা গতির তুলনা আভাসে দেওয়া হয়। তুলনা দেওয়া হয়

মনুষ্যেতর প্রাণী ও বস্তুর গড়ন রঙ বা গতির সঙ্গে। যেমন পদ্মের পাপড়ির সঙ্গে মানুষের চোখের, গজের গমনের সঙ্গে স্ত্রীলোকের চলনের, বিম্বের রঙের সঙ্গে ওষ্ঠের রঙের, সাদৃশ্য কল্পিত হয়েছে। মনুষ্যেতর জীব বা বস্তুর সঙ্গে তুলনা দেওয়ার কারণ এই যে, তাদের আকৃতি ভঙ্গী রঙ অপরিবর্তিত আছে। সেইজন্য ঐ সবের আকৃতি ভঙ্গী রঙ সৌন্দর্যের ধ্রুবমান হিসাবে ব্যবহারযোগ্য। এই ধ্রুবমানগুলি শিল্পীরা প্রকৃতি থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে ধার্য করেছেন।

কিন্তু, বহু দিন ধরে একই বস্তুকে অন্য-এক নির্দিষ্ট বস্তুর সঙ্গে অভ্যাসবশে তুলনা করার জন্য ছবির মধ্যে একটি দোষ দাঁড়ায়। পট তাকেই বলে যে ছবি ঐ দোষে দুষ্ট। কালে কালে জাতির পরিবর্তিত রুচি অনুযায়ী এর পরিবর্তন হওয়া চাই ; নূতন নূতন সাদৃশ্য শিল্পীর নিজে নূতন করে আবিষ্কার করা চাই।

ছবির যে ভাগের কথা বলা হল, এ খুব মোটামুটি হিসাব। অনেক সময় উল্লিখিত একাধিক লক্ষণ একই ছবিতে মিলে থাকে, সে ক্ষেত্রে যেটি মূল প্রেরণা বা যার প্রাধান্য তারই হিসাবে শ্রেণীনির্দেশ সম্ভব। এই সব বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ লক্ষণ সব দেশের শিল্পেই দেখা যায়। তবে কোথাও এক ধরনের কোথাও বা অন্য ধরনের উপর বেশি ঝোঁক দেওয়া হয়। এবং এমনও বলা যায় যে, যুগে যুগে, অনেকটা ঘড়ির দোলকের মতোই, জাতির মন অনুকারক ব্যঞ্জক আর ছান্দসিক এই তিনের মধ্যে যাওয়া-আসা করে।



ফোয়ারার মতো
উৎসারিত রেখার
ছন্দে রচিত অলংকরণ

শিল্পে শারীরস্থানবিদ্যার প্রয়োগ

ভারতের আধুনিক চিত্রকর ও মূর্তিকরদের মনে শারীরস্থান-শিক্ষার সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন ওঠে ; কারণ ঐ বিষয়ে কিছু অস্পষ্টতা থেকে গেছে। প্রশ্নগুলি ও সেই সম্পর্কে আমাদের যা মনে হয় একে একে আলোচনা করা যাক।

(১) বিলাতি একাডেমিক শিল্পীদের মতো প্রাচ্য শিল্পীদের শারীরস্থান শেখার দরকার আছে কি না ?

(২) শারীরস্থান জানলে প্রাচ্য শিল্পের কিছু অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে কি না ? কারণ, পূর্বোক্ত বিলাতি শিল্পীদের ধারণা যে, শারীরস্থানের ভুল থাকাই প্রাচ্য শিল্পের বিশেষত্ব।

(৩) আলংকারিক (decorative) শিল্পে শারীরস্থানে সত্য বজায় রাখা যায় কি না ?

(৪) প্রাচ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিল্পে শারীরস্থান (anatomy), পরিপ্রেক্ষিত (perspective) ইত্যাদির বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম লঙ্ঘন করেও উঁচু দরের ছবি ও মূর্তি হয়েছে। তার কারণ কী ?

ভারতীয় শিল্পীকে দেহের কাঠামো, গড়ন ও মাপজোপ ভালো করেই জানতে হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে বিলাতি পদ্ধতিতে নয়।

বিলাতি শিল্পে শারীরস্থানের জ্ঞান বলতে বোঝায় ব্যবচ্ছেদ ক'রে দেহের গঠন সম্বন্ধে যা জানা যায়। কিন্তু, দেহের আকৃতি ও বিচিত্র গতিভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে দেহের গঠন সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, প্রাচ্য শিল্পে বোঝায় তাই। বিলাতি শিল্পী দেহের আঙ্গিক বিশ্লেষণ থেকে তার সমগ্রতায় পৌছোন, প্রাচ্য শিল্পী দেহের সমগ্রতাবোধ থেকে আঙ্গিক বিশ্লেষণে আসেন। একজন বিজ্ঞান বা 'ব্যাকরণ' থেকে শুরু করে প্রাণছন্দে বা life movementএ

উপস্থিত হবার চেষ্টা করেন। আর-একজন প্রাণছন্দ থেকে শুরু করে বিজ্ঞান বা ব্যাকরণ শিক্ষা পুরা করেন। অতএব, শারীরস্থানবিদ্যা দেশি বা বিলাতি দুই শিল্পীকেই অর্জন করতে হয়; তবে তার ব্যবহার ও শিক্ষাপদ্ধতি ভিন্ন।

বিলাতি কায়দায় শারীরস্থানের জ্ঞান পৃথক ক্লাসে পৃথক ভাবে শেখবার ব্যবস্থা আছে। ঐসব ক্লাসে আদর্শ হিসাবে জীবন্ত মানুষ, পুরানো গ্রীক মূর্তি, মানুষ ও জীবজন্তুর কঙ্কাল, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদেহের পেশীসমূহের ছক বা চার্ট্‌ এবং কৃত্রিম-উপায়ে-রক্ষিত মৃত পশুপক্ষী প্রভৃতির সংগ্রহ থাকে। কাছাকাছি কোনো যাদুঘর বা চিড়িয়াখানার অভাবে এরূপ সংগ্রহ শিল্পীদের কল্পনাপ্রসূত মূর্তি বা ছবি করার সময় তুলনা করার কাজে লাগে বটে, কিন্তু রচনা কল্পনা করার পূর্বেই সেগুলি বহু ক্লেশে নকল করার কোনো সার্থকতা দেখি নে। অথচ, অনেক বিলাতি শিল্পীর ধারণা এই যে, কল্পনা করতে শেখার আগেই ঐরূপ নকল করতে শিখলে বেশ পাকা শিল্পী হওয়া যায়। কেউ বা বলেন, অঙ্কন (drawing) শেখবার জন্য ঐসব থেকে নকল করার দরকার আছে। ঠিক প্রাচ্য মতে অঙ্কনকৌশল আলাদা করে শেখার প্রয়োজন নেই; কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কনকৌশল শেখাই ভালো। অঙ্কন শেখার দরকার হলে সেরা শিল্পীর সেরা ছবি ও মূর্তি থেকে নকল করা উচিত; তাতে শিল্পশিক্ষার প্রধান জিনিস প্রাণশক্তির ও ছন্দের বোধ নষ্ট হয় না বরং অঙ্কন শেখার সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়তে থাকে।

আমাদের মতে প্রাচ্য শিল্পীর পক্ষে শারীরস্থান শেখার সময় পুরা দেহটির একটি মোটামুটি খসড়া (outline) ও ভঙ্গী ঠিক করে নিয়ে তার পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটির জ্ঞান অনুশীলন (study) করা উচিত।

অনুশীলনের ঠিক সময় হল যখন মানুষ বা জীবজন্তু নড়েচড়ে অর্থাৎ ক্রিয়াশীল থাকে; যখন দেহের সন্ধিগুলির পরস্পরসম্বন্ধ এবং পেশী ও পেশীরজ্জুগুলির[২] ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। ঐভাবে দেহের সক্রিয় অবস্থার

২ পেশী = muscle. দেহসন্ধি বা অস্থিসন্ধি - joint. পেশীরজ্জু বা কণ্ডরা = tendon.

অনুশীলন করলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বা শারীরস্থানের খুঁটিনাটি মনে রাখা সহজ হয়, অনুশীলন স্বাভাবিক ও জীবন্ত হয়। জীবজন্তু যখন আত্মভোলা হয়ে কিছু করে তখন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নডাচড়ার সঙ্গে মনের সঙ্গে গভীর যোগ থাকে ; সেজন্য তা শিল্পীর মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করে, ওর শরীরের কোন্ অঙ্গটি কী ভাবে কোন্ প্রয়োজনে লাগে সেটি বোঝবার সুবিধা হওয়ায় জ্ঞানের বিকাশ সহজে হয় এবং শিল্পীর মনে যে ছাপ পড়ে তা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়।

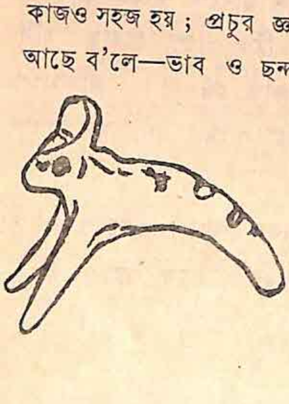


ভালো শিল্পীর রচিত মূর্তি বা ছবি থেকেও শারীরস্থান শেখা যায়, কারণ তার ভঙ্গী খাঁটি (sincere) ও যথাযথ হয়। ফরমাশ-মতো-সাজিয়ে-বসানো মডেল দেখে বা ডামির সাহায্যে কল্পনা করা ভালো নয়। কারণ ফরমাশমতো ঢঙ (pose) দিতে গেলে তা সাঁচ্চা হয় না ; অনেকক্ষণ এক ভঙ্গীতে থাকা আয়াসসাধ্য ও ক্লেশকর, তাতে মডেলের মনের সঙ্গে দেহের ভঙ্গীর সামঞ্জস্য থাকে না। ডামি তো একেবারেই প্রাণহীন। ফলে এদের সাহায্য নিয়ে কল্পনা করার চেষ্টা করলে মূর্তিতে ছবিতে আড়ষ্ট প্রাণহীন ভাব প্রকাশ পায়। অবশ্য, যে শিল্পীর প্রাণছন্দের ঠিক ধারণা হয়েছে তিনি ঐরূপ কৃত্রিম আদর্শের সাহায্য নিলেও কোনো ক্ষতি হয় না। অধিকাংশ বিলাতি শিল্পী আদর্শ ছাড়া মূর্তি বা ছবি করতেই পারেন না ; মন থেকে কল্পনা করতে গেলে বড় অসুবিধায় পড়েন।

শারীরস্থান মুখস্থ করার মতো শিখলে বা নকল করলে অঙ্কনের দক্ষতা হয়তো বাড়তে পারে কিন্তু মন ভাবের দিকে উপবাসী থাকে, ক্রমশ কল্পনা-শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রাচ্য শিল্পীর পক্ষে বিলাতি শিল্পীর অনুকরণে প্রথমেই এত কষ্ট করে শারীরস্থান শেখার দরকার করে না। কারণ, প্রাচ্য শিল্পে কল্পনা করার সময় কেবল প্রাণছন্দের জ্ঞান থাকলেই কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। তাতেই ভাব-প্রকাশ চলতে থাকে। ক্রমশ, শিল্পীর পর্যবেক্ষণ যত বাড়তে থাকে তার কল্পনাতে খুঁটিনাটি গড়নের জ্ঞান যোগ হতে থাকে। কিন্তু, তা যতটুকু দরকার ততটুকুই ব্যবহার করা উচিত। খুঁটিনাটি দিতে গিয়ে যেন প্রাণছন্দ না নষ্ট হয়ে যায়। ভাবের যথাযথ ভঙ্গী গতি ও ছন্দ মূল প্রাণছন্দকেই আশ্রয় করে থাকে। প্রাণছন্দের জ্ঞান মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এমন কি, ছোটো ছেলের আঁকা ছবিতেও এর ব্যতিক্রম হয় না। ছোটো ছেলের আঁকা ছবিতে প্রাণছন্দ স্পষ্ট হয়; কারণ, তারা ঐ দিয়েই আঁকা শুরু করে। গ্রামের কুমোরদের করা পুতুলে এবং পটেও এর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। শিশুর ও গ্রাম্য কারিগরের কাজ সহজ হয়, বেশি গড়নের জ্ঞান তাদের নেই ব'লে। উঁচু দরের শিল্পীর কাজও সহজ হয়; প্রচুর জ্ঞান তাঁর আয়ত্তে আছে ব'লে—ভাব ও ছন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে গড়নের অনাবশ্যক জটিলতা তিনি বর্জন করতে পারেন।







প্রাণছন্দ কী? শিল্প সৃষ্টিতে যে রেখার ইঙ্গিতে প্রত্যেক বস্তুর ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তু মিলিয়ে সমগ্র রচনার একটি ঐক্য ও চারিত্র্য ফুটে ওঠে তাই।



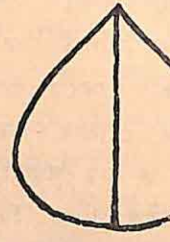
প্রাণ বলতে প্রথমেই একটি স্পন্দন বোঝায়। তারপর বস্তুর ঘনত্ব ও ভার-অনুযায়ী কতকগুলি স্বাভাবিক গতির সৃষ্টি হয়, যেমন ওঠা, পড়া, ঘোরা, গড়ানো, ভাসা, লাফানো ইত্যাদি; আবার প্রাণীর ইচ্ছা অনুযায়ী কতকগুলি গতি ও ভঙ্গী আছে, ঐগুলি তার বিভিন্ন মনোবেগ (emotion) বা মনোবিকার আশ্রয় করে প্রকাশ পায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, ঘৃণা, ভয় শোক ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রাণীতে জীবনী-শক্তির ইতরবিশেষ থেকে কোনো আবেগ কম বা বেশি হয়। এই-সব আবেগের রূপ আলাদা করে দেখাবার উপায় নেই। প্রাণীর অন্তরের এক-একটি বিকারের সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে এক-একটি ভঙ্গী প্রকাশ পায়, সেই ভঙ্গীকেই সেই আবেগের রূপ বলে ধরে নিতে হবে।

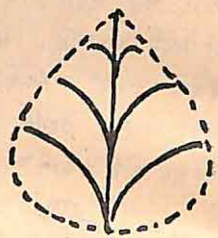


বিশেষ প্রাণীতে বিশেষ কোনো আবেগ সর্বদা দেখা যায়, ফলে ঐ প্রাণীর দেহে তার ছাপ স্থায়ী হয়ে ঐ ভাবের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। বাঘ হিংসার প্রতীক, খরগোস-হরিণ ভয়ের প্রতীক।



ভঙ্গীগুলি প্রধানতঃ প্রাণীর শিরদাঁড়া আশ্রয় করে থাকে আর শিরদাঁড়ার ভঙ্গীটি বা রেখাটি পাশ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। এই প্রাণছন্দের রেখাটির আশ্রয়েই শরীরের ভারসমতা (balance), কাঠামো (construction), এবং ঘনত্ব (volume) লক্ষ্য করার বিষয়। প্রাণছন্দ যেমন ঐগুলিকে নিয়মিত করে তেমনি ঐগুলির দ্বারা নিয়মিত হয়।





প্রাচ্য প্রতিমাকারের কাজেও প্রাচ্য শিল্পে শারীরস্থানের প্রয়োগ কিরূপ তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রতিমাকার কাঠামো তৈয়ারি, খড় বাঁধা, একমেটে, দোমেটে সারা হলে, গড়নের খুঁটিনাটি যোগ করে। খড় লাগানো আর একমেটে হলেই ভঙ্গী ও গড়নের আদ্‌রাটি ধরা পড়ে

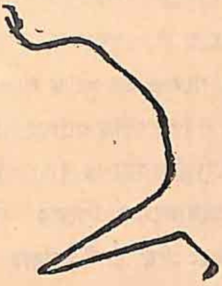
খুঁটিনাটি গড়ন দুপ্রকার। এক বস্তুঘেঁষা (realistic), আর-এক মনগড়া (conventional)। প্রাচ্য শিল্পীর মন অলংকারপ্রবণ ও ছন্দপ্রিয় হওয়ায় মনগড়া রূপই এদেশীয় শিল্পে উপযোগী হয়েছে।

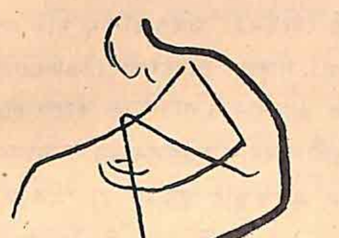


যেমন মণ্ডনশিল্পে কোনো নকশা করতে হলে[৩] তার সীমা বিভাগ ও গতি-ভঙ্গী আগে ঠিক করে নেওয়া হয়, পরে তাতে ইউনিট (motif, unit) যোগ করা হয়—তেমনি কোনো ছবি বা মূর্তি করতে হলে আগে প্রাণছন্দের রেখা ও ভঙ্গী ঠিক ক'রে তার উপর অবয়বগুলির মনগড়া রূপ বা মুদ্রা যোজনা করা হয়। যাঁরা বস্তুঘেঁষা ছবি আঁকবেন



৩ লেখকের *Ornamental Art* পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।







তাঁরাও প্রাণছন্দের রেখার উপরে, ভঙ্গীর উপরে, বাস্তব রূপ গড়ে তুলবেন। দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় শিল্পীকেই প্রাণ-ছন্দসূচক রেখার ইঙ্গিতেই সৃষ্টি আরম্ভ করতে হয়, উভয়ের কাছেই তার সমান মূল্য। মুদ্রা আপনা থেকে গড়ে ওঠে যখনই শিল্পী ছবি বা মূর্তি কল্পনা করতে গিয়ে বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গড়নের সঙ্গে মনের আবেগ যুক্ত ক'রে তার তারতম্য ঘটান।

সজীব আদর্শ বা মডেল ব্যবহার করার রেওয়াজ না থাকায় প্রাচ্য শিল্পী বস্তুর রূপ মনে ধ'রে রাখার এক উপায় উদ্ভাবন করেছেন। কোনো একটি বস্তু মনের মধ্যে ধারণা করতে হলে প্রকৃতি থেকে তুল্য গড়নের কোনো প্রিয়বস্তুর রূপ ও গুণের সঙ্গে তুলনা করে মনে রাখা হয়। একেই ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে সাদৃশ্যবোধ বলেছে। এই উপায়েই বিশেষ রূপের বিশেষ মুদ্রা তৈরি হয়েছে। চোখের গড়ন মনে রাখতে পদ্মকোরকের সাদৃশ্য মনে রাখা দরকার। পদ্মকোরকের সঙ্গে তুলনা হওয়ার কারণ তার গড়ন, তার মনোহারিতা। বিভিন্ন রূপের গড়ন গতি ভাব ও অনুষঙ্গ

(association) তুলনা করে বিভিন্ন সাদৃশ্যের কল্পনা ও ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে।[৪] পুরাতন কবিদের উপমা-কৌশলেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।



শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে বিভিন্ন আশ্রয় এবং উপকরণের বাধা অতিক্রম করবার প্রয়োজনেও শিল্পের বিভিন্ন ভাষা এবং সেই সেই ভাষায় বিভিন্ন মুদ্রার উদ্ভব হয়েছে।

প্রাচ্য শিল্পীরা বহু শতাব্দ ধরে কয়েকটি মাত্র মনগড়া ও বস্তুঘেঁষা রূপ ব্যবহার ক'রে উৎকৃষ্ট ছবি ও মূর্তি করে গেছেন। যদিও ছবি বা মূর্তি সৃষ্টি করার ব্যাপারে ভঙ্গী, প্রমাণ (proportion), সাদৃশ্য, ভারসমতা (balance), এই কয়টিই প্রধান অবলম্বন তবুও তাকে প্রাণবান ও লাবণ্যযুক্ত করতে হলে স্বভাব থেকে নূতন আকৃতি ও নূতন ভঙ্গী বারবার অনুশীলন করা আবশ্যক। কেবল পরম্পরা (tradition) থেকে নকল ক'রে ছবি করলে তা একঘেয়ে হয়ে পড়ে ; আবার কেবল স্বভাবের নকল করলে তা ছবি না হয়ে ফোটো বা প্রতিকৃতি হয় মাত্র, তাতে নিজস্বতার রস কিছুই থাকে না। প্রতিভাবান শিল্পী স্বভাব ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে ও স্বভাব থেকেই মনোমত সাদৃশ্য খুঁজে মুদ্রা রচনা করেন। আবার পরম্পরাগত মুদ্রাগুলিতে প্রাণসঞ্চারও করতে পারেন ; কারণ, স্বভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় বশতঃ প্রত্যেকটির গূঢ় অর্থ তিনি বোঝেন এবং স্বাভাবিক গড়ন গুণ ও গতি তাতে নূতন ক'রে যোজনা করতে পারেন।

আসলে, সব শিল্পসৃষ্টিই মনগড়া, তবে কোথাও বা অলংকারঘেঁষা, কোথাও বা বস্তুঘেঁষা। বস্তুঘেঁষা মুদ্রা ব্যক্তিগত হয়। বহু বস্তুতান্ত্রিক শিল্পী সারাজীবন

৪ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *Some Notes on Indian Artistic Anatomy* বা ভারত শিল্পে মূর্তি (বিশ্ববিদ্যা ৬২) দ্রষ্টব্য।

ধ'রে নিজ নিজ রচনায় একই ধরনের গড়ন ব্যবহার করে গেছেন। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং এই জন্যই বিশেষ বিশেষ শিল্পীর কাজ চিনে নেওয়া সম্ভব। তা বলে বলা চলে না যে, শিল্পীর কাজে মুদ্রাদোষ ঘটেছে। প্রতিভাবান শিল্পী ছন্দ ও ভাব প্রকাশ করতেই মত্ত থাকেন ; বিশেষ ক'রে গড়নেরই বৈচিত্র্য দেখাবার ইচ্ছা তাঁর মনে আসে না। ভাব ছন্দ ও রসসামগ্রীর প্রাচুর্য থাকায় রূপের পরিমিতি রূপায়নের গুণ ব'লেই গণ্য হয়। ভাব ও ছন্দের অল্পতা ঘটলেই রূপবৈচিত্র্যের অভাব একঘেয়ে মুদ্রাদোষে দাঁড়ায়।

শারীরস্থানের জ্ঞানলাভ করলে প্রাচ্য শিল্পের কিছু অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে কি না এবং শারীরস্থানের ভ্রান্তিই প্রাচ্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পের তফাত কোথায় জানা দরকার।

প্রাচ্য শিল্পের বিশেষত্ব হচ্ছে গতি ভঙ্গী ছন্দ ও ব্যঞ্জনা দিয়ে ভাবকে প্রকাশ করা ; স্বাভাবিক দেহের খুঁটিনাটি গড়ন সেখানে গৌণ। একে বলা চলে ব্যঞ্জক।

পাশ্চাত্ত্য শিল্পে স্বাভাবিক দেহের গড়নই মুখ্য, তাতে ভঙ্গী ও গতি যোজনা করে ভাবপ্রকাশ করা হয়। একে বলা উচিত নাট্যধর্মী।

প্রথমটির বেলায় অস্থি পেশী প্রভৃতির অল্প একটু ইঙ্গিত থাকলেই কাজ চলে ; দ্বিতীয়টির বেলায় তা পুরোপুরি থাকাই নিয়ম।

প্রাচ্য শিল্পী শারীরস্থান সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় জেনেও বিশেষ মূর্তি বা ছবির বিশেষ প্রয়োজন -মতো নিজের জ্ঞান কম বা বেশি ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধমূর্তির মতো অতুল শিল্পসৃষ্টিতে ওর প্রয়োগ ইঙ্গিতমাত্রে আছে। কেবল বুদ্ধমূর্তি ব'লে নয়, অন্য অনেক দেব বা অতিমানব মূর্তি মানবদেহী হলেও বাস্তব মানবদেহের সাদৃশ্য ও প্রমাণ তাদের কোনোটিতেই চলে না। প্রাচ্য শিল্পীকে বিশেষ ভাবের জন্য বিশেষ শারীরস্থানই কল্পনা করতে হয়েছে।

সহজ করার প্রয়োজন হয়েছে ব'লেই ঐরূপ করা হয়েছে, শিল্পীর জ্ঞান এবং অনুশীলনের অভাব বা অল্পতা -বশতঃ নয়।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, ঠিক ঠিক গড়ন রেখে ছবি বা মূর্তি হয় না কেন। তা হয় না। কোনো শিল্পীকে যদি বলা যায়, 'তোমার মূর্তিটি অমুক লোকের ছাঁচটির মতো' বা 'তোমার ছবিটি অমুকের ফোটো ব'লে মনে হয়', তা হলে শিল্পী দুঃখিতই হবেন এবং বলবেন, 'না, এটি আমার সৃষ্ট জিনিস, স্বভাবের অনুকৃতি নয়।'



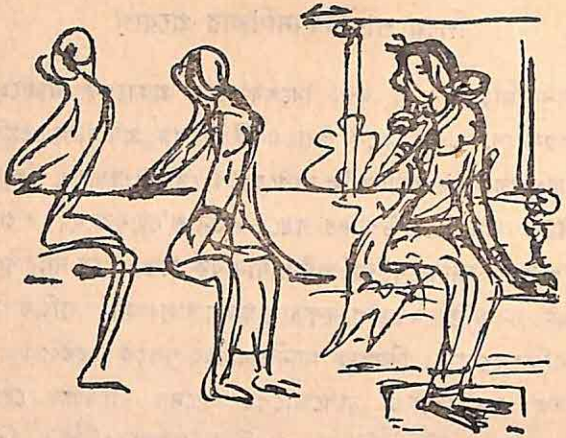
আলংকারিক[৫] শিল্পে শারীরস্থানের সত্য বজায় রাখা যায় কি না? অলংকরণশিল্পে যেমন নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে নির্দিষ্ট একটি গতিভঙ্গী ধ'রে নানা অলংকারমুদ্রা (ornamental motif) যোগ করে নকশা তৈয়ার হয়, প্রাচ্য শিল্পী সেই ভাবেই কোনো মনুষ্য বা প্রাণীর ছবি বা মূর্তি করবার কালে মানুষ বা প্রাণীর প্রাণছন্দের রেখাটি ও মোটামুটি একটি আদ্‌রা এঁকে নিয়ে তার পর দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা (conventional form) যোগ করেন। আলংকারিক রীতিতে ছবি বা মূর্তি করতে গেলে স্বাভাবিক চেহারার সঙ্গে ঠিক মেলে না; বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরস্পর মাপে বা প্রমাণে অদলবদল ও কমবেশি হয়ে থাকে। মণ্ডনের নিজস্ব গতিভঙ্গী -বশতঃ তার

৫ আলপনা, কার্পেট, জালিকাজ, বিভিন্ন দ্রব্যের উপর নকশা, যা, কেবল স্থানবিশেষ বা বস্তুবিশেষকে অলংকৃত বা মণ্ডিত করবার জন্য প্রযুক্ত হয় তাই অলংকরণ বা মণ্ডন। ঐজাতীয় কাজের ছাঁদ যে চিত্র বা মূর্তিতে পাওয়া যায় তাকেই মণ্ডনঘেঁষা বা আলংকারিক বলা হয়েছে।

ঝোঁক ও টান বজায় রাখবার জন্য, বিশেষ ভাব প্রকাশের আগ্রহে, বিশেষ সাদৃশ্যের অনুসরণে, একটি রূপে অন্য-একটি রূপের প্রমাণ আরোপিত হয়। ফলে, উপমিত বস্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি মাপজোপে ছোটো-বড় হয়, কিছু বা বাদ যায়, কিছু বা উপমান থেকে উপমিত বস্তুতে নূতন ক'রে যুক্ত হয়। দেব দানব অবতার প্রভৃতি অতিমানব মূর্তির প্রমাণ মানবিক হতে পারে না, পূর্বেই বলা হয়েছে; এই সব মূর্তির নবতাল দশতাল দ্বাদশতাল আদি কল্পিত মাপজোপ শিল্পশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে; শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের পুস্তকেও দ্রষ্টব্য।

স্বাভাবিক মানবদেহেও মাপজোপের অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়— আয়ু স্বাস্থ্য জাতি প্রকৃতি পরিবেশ প্রভৃতির প্রভেদ থেকে। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ; পুরুষ, নারী; কৃশ, স্থূল; বামন, দীর্ঘ; আর্য, অনার্য ইত্যাদি। এত বৈচিত্র্য, এত বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও মানুষে মানুষে পেশী ও পেশীরজ্জুর ক্রিয়া এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মোটামুটি গড়ন একপ্রকার থাকে। ফলতঃ, স্বভাবে, আর কাজে-কাজেই শিল্পে, শারীরস্থানের যাথার্থ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আলাদা আলাদা মাপজোপে তত নির্ভর করে না যতটা করে—মেরুদণ্ড, অস্থিসন্ধি, ঐ সন্ধিস্থান-গুলির আশ্রয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ঘোরাফেরা, এই কয়টি জিনিসের উপর।

শেষ প্রশ্নের উত্তর বোঝবার পক্ষে পূর্ববর্তী আলোচনা অনেকটা সহায় হবে। শারীরস্থান ও পরিপ্রেক্ষিতের বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম লঙ্ঘন করেও প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে উঁচু দরের শিল্পসৃষ্টি হয়েছে যে তা স্বতঃপ্রমাণিত; এর কারণ খুব সংক্ষেপে এই বলা যায় যে, ঐসব ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর অর্থাৎ শিল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিল্পীর একাত্মবোধ হয়েছে; বিষয়বস্তুর সত্তা ও প্রাণছন্দ সম্বন্ধে শিল্পীর পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ও পরিপূর্ণ বোধ হয়েছে।



ছন্দ

রসপ্রেরণার প্রথম আবেগেই যে ছন্দের সৃষ্টি হয় তাকেই বলি প্রাণছন্দ ; যে বিশেষ রসটির মূর্তি দিতে হবে এই প্রাণছন্দের ভঙ্গীতেই তার বিশেষ চরিত্র ও গুণ নিহিত থাকে। চিত্রে চরম-প্রাণবন্ত একটি রেখাতেই এর অস্তিত্ব জানা যায়, এই রেখাটিতেই সমস্ত চিত্রটির প্রথম প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়। এই একটি রেখাপাতমাত্রে চিত্রে অখণ্ড ঐক্য ও বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে।

প্রাণছন্দের এই আদিম রেখাটি থেকে প্রসৃত হয়ে অন্যান্য রেখার ভঙ্গীতে চিত্রের পটভূমি ব্যেপে একটি সর্বাঙ্গীণ ছন্দের সৃষ্টি হয়। প্রাণছন্দের মৌল আবেগকেই ধারণ করা, পোষণ করা, নানা দিকে নানা পথে প্রবাহিত ক'রে দেওয়া তার কাজ ; এই ছন্দের গুণে অনুকূল প্রতিকূল নানা রেখার নিখুঁত সমন্বয়ে এমন একটি দোলার বা তরঙ্গের সৃষ্টি হয় যাতে মূল প্রাণছন্দকেই সর্বত্র অনুভব করা যায়।

ছন্দ ভেঙে ভেঙে হয় 'অলংকার' বা কারুকার্য। নদীর প্রবাহ—তার তরঙ্গ—তার পরে তার চূর্ণ সলিলমুষ্টি, ফেনস্তবক ও কীর্ণ শীকররাজি যেমন, এও তাই। এই অলংকরণের গুণে ছন্দেরই সর্বশেষ ঝংকার যেন এখানে সেখানে বাজতে থাকে। উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির এটিও একটি লক্ষণ, এটিও চাই।

শিল্পসৃষ্টির মূলসূত্র

শ্রদ্ধা, অনুরাগ, আকর্ষণ, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ও সামঞ্জস্যের বোধ, এগুলিই শিল্পসৃষ্টির গোড়ার কথা।

সৃষ্টি হয় অনুরাগের পথে, তার সাধনা অনুরাগকেই আশ্রয় ক'রে। অনুরাগ আগে, বিচারবিশ্লেষণ পরে।

মহাপ্রাণ রূপে রূপে ছন্দিত হচ্ছে, এই উপলব্ধি ছাড়া শিল্পসৃষ্টির অন্য কোনো হেতু নেই।

বিশ্বজগতে এই সৃষ্টির ছন্দ দুর্নিবার গতিতে চলেছে ; সৃজনের এই লীলা যাতে অন্তহীন ও অব্যাহত থাকে সেজন্য প্রকৃতি নিজের বাধা যেন নিজেই সৃষ্টি করছে ; আবার ভিন্নকে অভিন্নের মন্ত্র দিচ্ছে।

প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুর রূপ এবং সেই সমস্ত রূপ আমাদের মনে যে বিচিত্র ভাব ও রস উদ্রিক্ত করে শিল্পী তা ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ে বিভিন্ন করণ (tool) উপকরণ (material) ও কৌশল (technique) সহায় ক'রে প্রকাশ করেন।

শিল্পী বস্তুর রূপ সচেতন ভাবে দেখেন। অর্থাৎ, নিজের সত্তা ও নিজের গুণ তিনি জানেন ; নিজেকে বস্তুর সঙ্গে একীভূত করা আর বস্তু থেকে পৃথক করা, এই উভয় প্রকার ক্ষমতাই তিনি রাখেন।

শিল্পী বস্তুকে গুণ-সহিত দেখেন। সাধারণে বস্তুর রূপ উদাসীন অন্যমনস্ক মন নিয়ে দেখে, কাজেই তার গুণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয় না—রূপে রূপে প্রভেদটুকু মাত্র দেখে ; অথবা রূপ-গুণের সম্বন্ধটি ঠিক না জানায় কখনো স্থূল রূপের প্রতি, কখনো বিচ্ছিন্ন গুণের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। শিল্পী নন, আসলে রূপে ও গুণে তফাত নেই ; রূপের সবটাই গুণ এবং গুণের প। শিল্পীর পক্ষে বস্তুর একটি কোনো বিশেষ গুণে আকৃষ্ট হওয়াটাই

প্রধান কথা। (একেবারে, এক মুহূর্তে, বস্তুর সব গুণের ধারণা কোনো মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক নয়)। শিল্পীও প্রথমে বাহ্যিক রূপের দ্বারা আকৃষ্ট হন, পরে গুণের ধারণা হয়। এই আকর্ষণের কারণ নির্দেশ করা যায় না; জনে জনে তা বিভিন্ন।

বাহ্য রূপ থেকে গুণে পৌঁছোন, গুণটি বুঝে যখন রূপে আবার ফিরে আসেন তখনই শিল্পের রূপ শিল্পীর চোখে নির্দিষ্ট ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই বাহিক রূপের রূপান্তর হয়, কিন্তু একেবারে রূপ-ছাড়া গুণের কোনো চিত্র বা মূর্তি হয় না। অবচ্ছিন্ন (abstract) গুণের ধারণা বিচারবিশ্লেষণের কাজে লাগে, এবং শিল্পীর ধ্যানজ্ঞানের অধিগত হলে তাঁর কাজেও বিশেষ দৃঢ়তা আনে। অনেক শিল্পী বিচ্ছিন্ন গুণের সূক্ষ্ম বা অপরোক্ষ অনুভব (intuition) থেকে বিশিষ্ট রূপ কল্পনা করেন; বিশেষ গুণের উপর ঝোঁক দেওয়াতে, না জানতেই, আপনা থেকেই, রূপের বদল হয়ে যায়—গড়নের মাপজোপে কমবেশি হয়।

এ কথা অন্যত্রও বলেছি, স্বকীয়তা (Originality), স্বভাব (Nature), পরম্পরা (Tradition), এই তিনকে ধরে শিল্পের সাধনা।

প্রথমে স্বকীয়তার কথা। সৃষ্টি করার স্বতঃসিদ্ধ আবেগ থাকা চাই, শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে সেইটেই পনেরো আনা আবশ্যক; বাকি এক আনা শিক্ষায় ও সাধনায় অর্জন করা সম্ভব। স্বকীয়তার উদ্ভব স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব থেকে। ব্যক্তিত্ব সকলেরই আছে। কিন্তু অজ্ঞের ব্যক্তিত্বে ও বিজ্ঞের ব্যক্তিত্বে অনেক তফাত। অজ্ঞের ব্যক্তিত্বে ক্ষুদ্র অহংকার, অন্ধতা, সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, নিরর্থক জটিলতা, এইগুলিই প্রকাশ পেতে চায়; সুতরাং প্রকাশে স্বচ্ছতার হানি হয়, যথার্থ প্রকাশে বাধা পড়ে। বিজ্ঞের ব্যক্তিত্বে সমতা উদারতা ধী প্রভৃতি গুণের সমবায়ে ক্ষুদ্র অহংকার ক্ষুদ্রতা হারাতে থাকে এবং ব্যক্তি ও

বস্তু -মাত্রেই দরদ ও প্রীতি ক্রমশ বাড়তে থাকায় ঐরূপ শিল্পীর সৃষ্টিতে প্রকাশ অবারিত সহজ ও স্বচ্ছ হয়।

সংক্ষেপে, যে শিল্পীর রসবোধ নেই কার্যতঃ তাঁর স্বকীয়তাও নেই ; রস-বোধের উৎকর্ষ -সাধন করতে পারলেই শিল্পীর স্বকীয়তা পুষ্ট হয়।

(রসবোধের উৎকর্ষ কেমন ক'রে হয় সেইটেই পরের কথা, শিক্ষা ও সাধনার কথা। স্বভাবের সম্মুখীন হয়ে তার সযত্ন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন (study) আবশ্যক। যাঁর স্বকীয়তা আছে, প্রতিভা আছে, তিনি যদি স্বভাবের অনুশীলন না করেন তো ক্রমশ তাঁরও কাজ একঘেয়ে ও শুষ্ক হয়ে পড়তে বাধ্য। কারণ, স্বভাবে সজীবতা ও অনন্ত বিচিত্রতা আছে ; তা থেকে শিল্পীর সৃজনচেষ্টা নিত্যনূতন বেগ লাভ করে। স্বভাবে অন্তহীন রূপবৈচিত্র্যের অন্তরালে নিয়মের ঐক্যও আছে ; অনুশীলনের ফলে শিল্পী নিজেই যে মূলসূত্রগুলি আবিষ্কার করতে সমর্থ হন তাতে তাঁর রচনা দৃঢ়তা ও বিশিষ্টতা পায়।)

শিক্ষার ও সাধনার পক্ষে পরম্পরার অনুশীলনও অপরিহার্য। আগে নিজের দেশের, পরে অন্যান্য দেশের, শিল্পীরা, প্রতিভাবান স্রষ্টারা যুগে যুগে যে কাজ করে গেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে, তার অনুশীলন করা চাই। তবেই শিল্পীর অপরিস্ফুট প্রতিভা প্রস্ফুটিত হবে। তাঁদের প্রকাশরীতি ও কৌশলের সঙ্গে, পদ্ধতির সঙ্গে, তুলনা ক'রে ক্রমেই স্পষ্টতা ও উৎকর্ষ অর্জন করা যাবে।

শিল্পসৃষ্টির অনন্য পদ্ধতি ব'লে কিছু নেই। কাজ চালাবার জন্য প্রথমে একটি পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। সৃষ্টির মূলতত্ত্বকে একবার জানা ও পাওয়া গেলে তখন বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা ক'রে, ব্যবহার ক'রে, নিজেরই পদ্ধতিকে সচল সরল ও দৃঢ় করা চলে।

শিল্পপ্রসঙ্গ

শিল্পবস্তু কাকে বলে ?

শিল্প হল কল্পনা। রেখায় রঙে রূপে রসানুভূতির প্রকাশ। রসের উদ্রেক করাতেই তার সার্থকতা। প্রকাশের জন্য করণকৌশলের প্রয়োজন আছে; সে হল উপায়, উদ্দেশ্য নয়; করণকৌশলের জ্ঞান শিল্পের প্রেরণাও নয়। শিল্পীর কাজে রসেরই প্রেরণায় রূপের একটি প্রাণময় ছন্দ সৃজিত হয় এবং বিশেষ রূপের বিশেষ ছন্দ বিশ্বব্যাপী প্রাণের ছন্দে মিলিত ও সমন্বিত হয়। এ'কে দরদ বলা চলে; এই দরদের ফলে শিল্পী যা তাঁর ধ্যানের বস্তু, যা তাঁর প্রকাশের বিষয়, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। শিল্পের ভিতর শিল্পীও অমরতা পান। শিল্পীর জীবন, শিল্পীর সত্তা, শিল্পের স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিভাত হয়; উভয়কে পৃথক করা চলে না।

শিল্প হল সৃষ্টি। স্বভাবের অনুকরণ নয়। বাহ্য স্বভাবের মধ্যে সৃষ্টির যে আবেগ নিরন্তর ক্রিয়াশীল শিল্পীর স্ব-ভাবেও তারই প্রেরণা, তারই ক্রিয়া; সুতরাং, অনুকরণের কথা ওঠে না। শিল্প হল শিল্পীর ধ্যান বা 'চিন্তা'; অন্যের ধ্যানে বা 'চিন্তা'য় সঞ্চারিত হতে হলে তাকে সংহত রূপ নিতে হয়। জনে জনে সঞ্চারিত হয় অনেক-কিছুই অনেক উপায়ে; রসের সঞ্চার হয় একমাত্র শিল্পের ভাষায়।

শিল্প হল ছন্দ। ভাব, অনুভূতি, রূপ, রঙ, গতি ছন্দিত হলে তবেই নন্দনীয়তা (aesthetic value) লাভ করে; রসের **সুষ্ঠুতম** প্রকাশ হল ছন্দে। শিল্পসৃষ্টিতে উদ্দেশ্য, উপায় ও উপকরণ যখন একই ছন্দে গ্রথিত হয় তখনই শক্তির আর কোনো অপচয় ঘটতে পারে না।

আলংকারিকদের ভাষায় বলতে গেলে, শিল্প হল ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। একটু রূপ, একটু রঙ, একটু রেখা, এই দিয়ে ইঙ্গিতে অনেকখানি ভাবনা ও বেদনার অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলা তার কাজ।

পরিপ্রেক্ষিত কাকে বলে ? চিত্রশিল্পে তার উপযোগিতা কী ?

'দৃশ্যমান বিষয়ের বিভিন্ন অংশের যেরূপ দূরত্ব নিকটত্ব ঘনত্ব ইত্যাদি বোধ হয় চিত্রে তদ্রূপ প্রকাশ'[১] পরিপ্রেক্ষিত নামে পরিচিত। ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যেতে পারে, চিত্রকরের জানা প্রয়োজন যে, একই আয়তনের দুটি জিনিসের মধ্যে কাছেরটি বড় ও দূরেরটি ছোটো দেখায়। ছবি আঁকতে গিয়ে এ কথা ভুললে চক্ষুর অভ্যাসকে বিভ্রান্ত করা হবে বা চাক্ষুষ পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম ভাঙা হবে। কিন্তু, এও তো মনে রাখা দরকার যে, চিত্র কেবল চোখের দেখা নয়। মনের দেখাতে দূরের জিনিসও কাছে আসতে পারে ; কাছের জিনিসও দূরে গিয়ে ছোটো হওয়া বা লুপ্ত হওয়া বিচিত্র নয়। নিকট ও দূরের কোনো ধ্রুবমান মনের ভিতর নেই। প্রাচ্য শিল্পী সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে এ কথা মানেন, সেজন্য প্রাচ্য চিত্রকলায় চাক্ষুষ বা স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিত নষ্ট হলেই যে সব সময়ে রসসৃষ্টির বা ছন্দসৃষ্টির হানি হবে এ কথা মানেন না। শিল্পীর চোখ তো শিল্পী নয়, মনই শিল্পী। শিল্পের রসগ্রহণও চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে।

আমরা একটা গাছ দেখেও দেখলাম না। যেমনি শিল্পীর তুলিতে তা রূপ পেল অমনি তার গূঢ় সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়ে মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করল—কেন এমন হয় ?

শিল্পী তো স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ করেন না। শিল্পের বিষয়ে তিনি কিছু যোগ করেন, তা থেকে কিছু বাদও দেন, রূপের এমন কিছু রূপান্তর ঘটান যাতে তা নূতনতার চমক দেয় দর্শকের চিত্তে।

এটা তো জানা কথাই যে, একটি বস্তুকে একই কালে সব দিক থেকে, সব ভাব থেকে, দেখা সম্ভব নয় এবং সেই বস্তুর সব দিক বা সব ভাব সকলের

[১] চলন্তিকা অভিধান দ্রষ্টব্য। মনে রাখা দরকার, দৃশ্যমান জগৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ -বিশিষ্ট, কিন্তু চিত্রের আশ্রয় কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ -বিশিষ্ট বা সমতল।

মনকে সমানভাবে আকর্ষণ করবে না। পাঁচজন শিল্পী যদি একই গাছের ছবি করেন, পাঁচ রকমের পাঁচখানা ছবি হবে। কেউ দেখবেন ও দেখাবেন তার পাতার সবুজ, কেউ তার পল্লবের দোল, কেউ তার ফুলের বাহার, কেউ তার উপর আলোছায়ার চমক। কেউ বা এ-সবের কিছুই বিশেষ লক্ষ্য না করে দেখবেন ও দেখাবেন—গাছটি যেন সন্ন্যাসী, শূন্য আকাশের নীচে ধ্যানমগ্ন।

শিল্প বুঝতে হলে শিল্পবস্তু দেখতে হবে। কী ভাবে দেখা দরকার?

শিশুর চোখ নিয়ে শিল্পবস্তু দেখতে হয়। অর্থাৎ, আগে থেকেই মনকে কোনো সংস্কারে বা কোনো অভিমতে আবদ্ধ রাখলে চলবে না; কেবল বিচার ক'রে, বিশ্লেষণ ক'রে শিল্প বোঝা যাবে না।

শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতের দান কী?

চীনারা নিসর্গচিত্র বা ল্যাণ্ড্স্কেপ্ অবলম্বন করে আত্মিক উপলব্ধি ও আত্মিক আবেগের প্রকাশে অতুলনীয় সিদ্ধি অর্জন করেছেন।

য়ুরোপে স্বভাবানুগত প্রতিকৃতি বা পোর্ট্রেট্ রচনার চরম উৎকর্ষ দেখা যায়।

ভারতীয় শিল্পপদ্ধতি মানব বা মানবেতর প্রাণীদের রূপকে প্রতীক ক'রে গভীর অধ্যাত্ম-অনুভবকে ভাষা দিয়েছে। ভারত ও চীনের শিল্পসংস্কৃতিতে প্রভেদ হল এই যে, চীনা শিল্পী নিজেকে স্বভাবের অঙ্গীভূত ক'রে স্বভাবের মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, আর ভারতীয় শিল্পী নিজেকে ও স্বভাবকে একই ছন্দে ছন্দিত জেনে স্বভাবকে নিজেরই সত্তার আর-এক প্রকাশ বা পরিচয় ব'লে জানছেন।

বুদ্ধমূর্তির তাৎপর্য কী?

বুদ্ধমূর্তি ঘনীভূত ধ্যানেরই মূর্তি, ব্যক্তিবিশেষের মূর্তি নয়। বিশেষ

একপ্রকার ভাব বা উপলব্ধি বিশেষ একপ্রকার বিগ্রহ বা টাইপ সৃষ্টি করতে চায়, সেটি সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়ার পর সে পথে আর অগ্রসর হওয়া যায় না। বুদ্ধমূর্তি এইরকম নিখুঁত একটি সৃষ্টি।

নটরাজ এরূপ আর-একটি সৃষ্টি। সমস্ত বিশ্বসংসার নিয়ে যে ছন্দ বা যে গতি এক শান্তির কেন্দ্র থেকে প্রসৃত হয়ে সেইখানেই ফিরে ফিরে আসছে, তারই বিগ্রহ।

বুদ্ধমূর্তিতে সমস্ত গতিটি নিয়ত শান্তিতেই বিধৃত হয়ে নিশ্চল চেতনারূপে আছে—নিবাত নিষ্কম্প নির্ধূম দীপশিখা তার উপমা।

একটা হুঁশিয়ারির কথা বলা দরকার। শিল্পের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যা তার সঙ্গে লৌকিক আচারধর্মের বা নীতিধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। শান্তি সমতা ও চেতনার প্রসার অনুভূত এবং প্রকাশিত হলেই হল।



মাটির পুতুল
বীরভূম

শিল্পসংগতি

শরীরে স্থূল ও সূক্ষ্ম যে কয়টা ইন্দ্রিয় আছে সেগুলিকে আশ্রয় করে সংগীত কাব্য চিত্র ভাস্কর্য স্থাপত্য নৃত্য অভিনয় কারু ইত্যাদি চৌষট্টি কলার সৃষ্টি হয়েছে। একটি অন্যটির 'পরে নির্ভর ক'রে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দিয়ে চিত্ত 'রস'কেই উপলব্ধি করছে এবং প্রত্যেক শিল্পযোগে সেই 'রস'কেই সাকার ও সুগোচর ভাবে সৃষ্টি করছে। মর্মগত এই রসের দিক দিয়ে সংগীত, কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য—কোনো শিল্প থেকে কোনো শিল্পের ভেদ নেই। এবং এটিও মনে রাখবার বিষয় যে, সমুদয় শিল্পকলা রূপের দিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট, কিন্তু ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে অপরিসীম, অনির্বচনীয়।

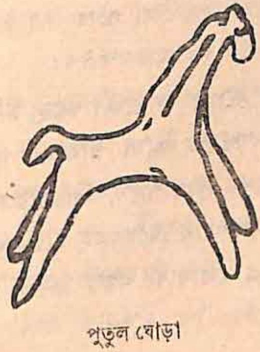
উপায় ও উপকরণের ভিন্নতা -বশতঃ কাব্য ও চিত্রের বহিরঙ্গে কিছু কিছু তফাতও দেখা যায়। যেমন, কাব্যে প্রথমে আসে ইঙ্গিত—গাছ, tree বা বিটপঃ, এইরূপ একটা শব্দপ্রতীক; পরে বস্তুর বোধ। চিত্রে প্রথমেই আসে বস্তু; রঙ ও রেখার ভাষাযোগে তা চিত্রের বিষয় হয়। অতঃপর কবিতার গাছ আর ছবির গাছ, কোনোটিই গাছ হিসাবে স্থির থাকে না, নিজ নিজ ব্যঞ্জনার দ্বারা রসিকের মনকে রসের অভিমুখে প্রেরণ করে।

অনেকে মনে করেন, চিত্রে একটি মুহূর্ত (moment, unit of time) নিয়ে কারবার, আর কবিতায় গানে অনেকগুলি মুহূর্তের প্রবাহ। তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, কথাটা শুধু আংশিক ভাবেই সত্য। ছবি চোখ খুলেই একেবারে দেখা যায় বটে, তা ব'লে সঙ্গে সঙ্গেই তার উপভোগ সম্পূর্ণ হয় না। চিত্রে অঙ্কিত গাছটি ফুলটি পাতাটি—খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয়টি ও প্রত্যেক কলাকৌশলটি ঘুরে ঘুরে দেখতে হয়; এই ভাবে যাকে এক মুহূর্তে চোখের সামনে দেখলাম তাকেই অসংখ্য মুহূর্তে টুকরো টুকরো ক'রে তবে আবার যথার্থ একটি মুহূর্তের রহস্যে পৌছতে পারি। আর, কবিতায় গানেও আসলে অনেক মুহূর্ত নেই। তার সবগুলি খণ্ড খণ্ড মুহূর্তকে অনুসরণ ক'রে যতক্ষণ না একটি অখণ্ড মুহূর্তের ধারণায় পৌচচ্ছি ততক্ষণ কবিতা বা গানকে পাইনি।

কবিতা বা গানের সূচনায় ঐ অনন্য মুহূর্তটি আছে আভাসে, পরিণামে আছে নিশ্চিত উপলব্ধিরূপে। সুতরাং, দ্রষ্টব্য আর শ্রোতব্য শিল্পে এ বিষয়েও আসলে ভেদ নেই।

শিল্পক্ষেত্রে একটা ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুকে অপর-একটা ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু ক'রে তোলা, শিল্পের একটা বিশেষ কৌশল। গায়ক বা কবি বিশেষ খুশি হন যখন সুর দিয়ে বা কথা দিয়ে রূপের আভাস দিতে পারেন—যখন প্রভাত বা সন্ধ্যা বা ঘনঘটার ছাপ ছন্দ ও সুরের গুণে ফুটে ওঠে। আবার শিল্পী ইচ্ছা করেন, তাঁর অঙ্কিত ফুলটিতে ফুলের পেলব স্পর্শ ও মিষ্ট গন্ধ অনুভব করা যাবে। এরকমই হয়। এবং এইজন্যই পূর্বে বলেছি, চৌষট্টি কলা একটি অন্যটির 'পরে নির্ভর ক'রে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সঙ্গে তুলনা ক'রে বুঝতে পারি, সমস্ত শিল্পসৃষ্টি কী ভাবে চলেছে। মাঝখানে অনির্বচনীয় রসঘনমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ সপ্রকাশা পরা-প্রকৃতিকে নিয়ে বিরাজ করছেন। তাঁর চারিদিকে বিভিন্ন শিল্প বিভিন্ন রসের হাত ধ'রে, বহু কৃষ্ণ ও বহু গোপিনীরূপে, মণ্ডলাকারে ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছেন —ছন্দে, তালে।



পুতুল ঘোড়া

বীরভূম

শিল্পদৃষ্টি[১]

পূর্বকালে বিদ্যার্থীরা আগে ব্যাকরণ আয়ত্ত করত দীর্ঘ কালের হাড়ভাঙা খাটুনিতে; তার পর তাদের অলংকারে ও কাব্যে অধিকার হ'ত। অর্থাৎ, আগে পরিশ্রম, পরে আনন্দ। কিন্তু আমরা কাব্য আর ব্যাকরণ একসঙ্গে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেছি। এখনকার কালে আনন্দ আগে, পরে পরিশ্রম। আনন্দই পরিশ্রমের শক্তি জোগাবে।

রূপরচনায় এত বেশি আয়াস লাগে কেন? সাধারণতঃ, আমাদের মনের সামনে একটা যেন চিক টাঙানো থাকে; সেইটে সরাতে না পারলে বস্তুকে যথার্থ দেখা যায় না, আর না দেখলে আঁকাও যায় না। দীর্ঘকালীন অনুরাগে ও অভ্যাসে কোনো বিশেষ প্রতিভাবান শিল্পী হয়তো এমন অবস্থা লাভ করেন যে যখন যে বস্তুর পানেই তাকান চোখের সামনে থেকে ঐ আবরণ সরে যায়, বস্তুর একটা না একটা দিক তাঁর মনের চোখে ধরা দেয়। রূপরচনা কাজেই তাঁর পক্ষে পরম সহজ হয়। আমাদেরও হবে। অনুরাগ ও অভ্যাস চাই।

ধ্যানের বিষয় সামনে নিয়ে ছাত্র সমস্ত বেলা পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে: নিষ্পত্র মহানিমের উর্ধ্বগ শাখায় প্রশাখায় সোনার গুটির মতো গুচ্ছ গুচ্ছ ফল।

তুমি আজ এই যে বৃক্ষের আরাধনা করছ, ছবি আঁকছ, যদি সত্যি একে ভালো লেগে যায়, এ তোমার সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে যাচ্ছে। জীবনে কোনো দিন হয়তো অশেষ দুঃখ পাবে, প্রিয়পরিজনকে হারাতে হবে, সংসার শূন্য মনে হবে, তখন পথের ধার থেকে এই গাছ বলবে, এই যে আমি আছি। তুমি সান্ত্বনা পাবে। এ তোমার অক্ষয় সঞ্চয় এ জীবনের নয় শুধু— জীবনান্তরেরও।

১ মৌখিক উক্তির অনুলেখন।

কোনো এক ছাত্রকে বনপুলকের গাছ আঁকতে বলা হয় এবং সেই সঙ্গে বোঝানো হয়।

কিছু কাল ধ'রে গাছটিকে দেখো আগে। গাছের কাছে গিয়ে বসে থাকবে—সকালে, দুপুরে, বৈকালে, সন্ধ্যায়, আবার নিশুতি রাত্রে। সে খুব সহজ হবে না। কিছুক্ষণ ব'সে থেকে আর ভালো লাগবে না। মনে হবে, গাছও যেন বিরক্ত হয়ে বলছে, 'তুই এখানে কেন ?—চলে যা !—যা বলছি'। তখন গাছের কাছে তোমায় কাকুতিমিনতি করতে হবে। বলতে হবে, 'আমার গুরুর আদেশ, অমান্য করবার উপায় নেই ; রাগ করো না তুমি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও ; আমার কাছে তুমি স্বরূপ প্রকাশ করো।' এই রকম ক'রে কিছু দিন নীরব সাধনা করার পর যখন মনে হবে গাছটিকে দেখেছ, তখন ঘরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে গাছের একটি ছবি তৈরি কোরো।

গাছের কিছু একটা আগে ভালো লাগা চাই ; তবে তো গাছটিকে দেখবে, তবে তো তোমার দেখা ক্রমশই সার্থক হয়ে উঠবে। ভালো লাগার সাধনাই শিল্পসাধনা। কিন্তু, প্রথম ভালো লাগাটি বিধিদত্ত জিনিস ; যার আছে সেই আর্টিস্ট, অন্যে কী ক'রে তোমায় দেবে ? অবনীবাবু বলতেন : গুরু আর্টিস্ট তৈরি করেন না, আর্টিস্ট হয়েই শিষ্য আসে। যেমন আলো বাতাস জল দিয়ে যত্ন ক'রে চারা-গাছ মানুষ করা। চারা-গাছ সৃষ্টি করবে কে ?

এক জায়গায় থাকতে থাকতে ক্রমশ ভালো লাগে। ভালো লাগে বিচিত্র সম্বন্ধসূত্রে। দেখা গেল, বনপুলক গাছটি আকাশের নীচে কেমন দাঁড়িয়ে আছে ; অমনি ভালো লাগল। অথবা দেখা গেল, তার ফুল ফুটেছে ; তাই ভালো লাগল। ফুল ঝরছে ; তাও হয়তো ভালো লাগল। নিছক বস্তু তো মনকে নাড়া দেয় না, একটা কিছু কারণ ঘটা চাই। মনটা খুশি আছে বলেই হয়তো ভালো লাগল, নয়তো গাছটার ভঙ্গী কি গড়ন কি শাখা ও পাতার ছন্দ ও রঙ সুন্দর ব'লেই মন খুশি হল।

কাগজের গোলাপ, যেমনটি তেমনিই আছে সব সময় : কতক্ষণ আর ভালো লাগে ? আসল গোলাপ কেবলই চলেছে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে সম্বন্ধের পর সম্বন্ধ রচনা ক'রে। সেই চলার ছন্দই তার জীবন। সেই বহুরূপী জীবনটি ঠিকমতো দেখা গেলে সে আর কিছুতে ফুরোয় না ; কাজেই কিছুতেই ফুরোয় না আর্টিস্টের ভালো লাগা।

অবশ্য, কাগজের গোলাপও ভালো লাগতে পারে বিশেষ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, বিশেষ স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে। তখন সেও শিল্পের বিষয় হয়ে উঠবে।

আসল কথা, যে জিনিস আঁকবে সেটি ভালো লাগা চাই। সে যেন তোমার মনোহরণ করে। তখন সেই ভালো লাগা তূলির ডগে আপনি ফুটে উঠবে। তা হলেই সত্যকারের ছবি হবে। ছবি আঁকার এই সব-চেয়ে বড়, সব-চেয়ে গূঢ় কৌশল।

মনে রস না পেলে, ভালো না লাগলে, ভালো লাগা দিনে দিনে বাড়তে না থাকলে, সেই ভালো লাগার প্রেরণাতেই কাজ না করলে, শুধু কলাকৌশল আয়ত্ত করবার চেষ্টা নিষ্ফল।...একবার আমার এস্রাজ বাজাতে শখ হয়েছিল ; নিয়মিত সা-রে-গা-মা সাধতে লাগলাম। কয়েকটা গৎও শিখেছিলাম। কিন্তু, যেই বাজানো বন্ধ করলাম ছ মাসের শিক্ষা নিঃশেষে ভুলতে ছ দিনও লাগল না আমার। কারণ, সংগীতের ব্যাকরণই শুধু 'মুখস্থ' করেছিলাম, রসের ভিতর প্রবেশ করি নি।

(অনুরাগ চাই, ধৈর্যও চাই ; সাধনার সফলতা চাই। শিল্পচর্চা একটা সাধনাই, শখ তো নয়।...নইলে অনেকে আছে, সেই আমেরিকান সাহেবের মতো করে। সে ভদ্রলোক সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসেছিল মহাত্মাজির আশ্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে ব'লে। আশ্রমের লোক বললে, 'এখন তাঁর সময় নেই ; তুমি দু-এক দিন থেকে যাও।' কিন্তু, সাহেব কী

করে থাকে? কোন্‌টার পর কী করবে সব তার আগে থেকে ছক কাটা আছে; পরবর্তী ট্রেনটা তার ধরাই চাই। কাজেই মহাত্মাজির সঙ্গে দেখা না ক'রেই চলে গেল। একে বলে মূঢ়তা। আর, দেখা হলেই বা কী লাভ হ'ত কে জানে! হয়তো নামসংগ্রহের খাতায় আর-একটা স্বাক্ষর পড়বে, এর থেকে বেশি তার আকাঙ্ক্ষাই ছিল না।

নিত্য অভ্যাস চাই। প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করা চাই। ভয় আর লোভ বর্জনীয়। শিল্পী যেটুকু অনুভব করবে শুধু সেটুকুই তার প্রকাশ করা উচিত।

কবির কখনো কখনো এরকম হয়, অবান্তর একটা শব্দের মোহ বা একটা উপমার মোহ বা একটা আইডিয়ার মোহ তাকে পেয়ে বসল। তেমনি শিল্পী হয়তো দেখলে, গাছের তলায় একটা লোক ব'সে আছে; ভালো লাগল; তার পর ছবি আঁকবার সময় একটা কুঁড়েঘর তার সঙ্গে জুড়ে দিলে বা গাছের পাতাগুলি ধ'রে ধ'রে আঁকলে বা আকাশের মেঘে রঙের বাহার দেখাতে গেল: সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ফলে ছবি নষ্ট হল। একেই বলে লোভ বা মোহ। পূর্বের কল্পনার সঙ্গে নতুন কল্পনার জোড় মিলল না ব'লেই ছবি নষ্ট হল।

পরম্পরাগত আদর্শ দরকার?—যদি সমস্ত পরম্পরাই কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় লোপ পায়, শিল্পকলা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হবে কি? শিল্পের কারণ আদিকারণে। যে আনন্দে সৌরজগতের আর পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, সেই আনন্দেই শিল্পী ছবি আঁকে। সুতরাং মহাপ্রলয়ের পর পুনরায় যেমন সৃষ্টি হবে, পুনরায় মানুষের মতো ধীমান জীবের জন্ম হবে, অমনি আর্টেরও শুরু হবে।

তবে পরম্পরাগত শিল্প ব্যাবসার মূলধনের মতো। তাকে খাটিয়ে অল্পায়াসে আরও অনেক ঐশ্বর্য লাভ করা সম্ভব হয়।

যে আর্টিস্ট্‌ সর্বত্র সকলেই তার বন্ধু, সে কখনো নিঃসঙ্গ হয় না। তোমায় ভালো লাগছে। তুমি চলে গেলে গাছটা ভালো লাগছে। গাছও নেই তো এই দরজাটাই ভালো লাগছে। ভালো লাগে কেন? বলা বড় কঠিন। তবে, আবেগপ্রবণ ভালো লাগা বা নিজের জিনিস ব'লে যে ভালো লাগা তার গভীরতা কম। কৌতূহলে ভালো লাগে, সেও অচিরস্থায়ী। আর-একরকম ভালো লাগা আছে, তা গভীর একাত্মানুভূতি। কোনো দৃশ্য এত ভালো লাগল যে মনে হল, তার মাঝখানে ম'রেও সুখ আছে।...সকলেই গভীর আশ্বাস দিচ্ছে; সকলেই যে বন্ধু। একটি বস্তুকে যে পরিমাণ ভালো লাগল সেই পরিমাণেই মরবার ভয় ঘুচে গেল। কারণ, জানলাম, আমি ম'রে গেলেও এ তো রইল; সে তো আমারই থাকা।

ছবি দু-রকম। এক, শিল্পী যে ছবি করেছে; আর, শিল্পী যে ছবি হয়েছে। ভালো ছবিতে আছে—বিষয়, পদ্ধতি এবং শিল্পী স্বয়ং।

ছবিতে রঙ দেওয়া সম্পর্কে বোঝবার কথা এই।—ধানখেতের সবুজ তোমার এত ভালো লাগা চাই যে, তুমি ঐ সবুজ হয়ে গেলে। তোমার সত্তার অন্তহীন পরিচয়ে ঐ পরিচয়টুকু যুক্ত হল। তার পর ছবি আঁকতে বসলে কেমন ভাবে সবুজ লাগাতে হবে, তার সঙ্গে অন্য কোন্‌ রঙটি কোথায় মানাবে, অন্তরঙ্গ অনুভব থেকেই অনায়াসে তুমি বুঝতে পারবে; তুলির ডগে যেন আপনি এসে যাবে। আর-এক কথা, আলংকারিক চিত্রপদ্ধতিতে শিল্পী ধানখেতের সবুজ আকাশেও দিতে পারে, মেঘেও দিতে পারে, পাহাড়েও দিতে পারে, তাতে কোনো দোষ হয় না। কারণ, প্রকৃতির কাছে শিল্পী শিখে নেয় রঙে রঙে সূক্ষ্ম যে সম্বন্ধ বা সংগতি, গভীর যে আত্মীয়তা, সেইটেই; নইলে সে স্বাধীন, স্বতন্ত্র। এই রীতি প্রাচীন রাজপুত মোগল বা পারসিক চিত্রে দেখা যায়। রচনার তাতে কিছুমাত্র ন্যূনতা না ঘ'টে বরং বিশেষ উৎকর্ষই হয়েছে।

যে পাহাড় দেখে নি, সে মেঘ আঁকতে জোর পাবে না। স্থিরতার ধারণা না থাকলে চঞ্চলতার ধারণা হয় না। ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যে যে রস আর চিত্তের ধ্যানমগ্নতায় যে রস, দুই-ই আর্টিস্টের জানা প্রয়োজন। আর্টিস্টের একদেশদর্শী হ'লে চলে না। তার হওয়া চাই সর্বদর্শী ও নির্লিপ্ত।

গল্প আছে : একজন বলেছিল, নবোদ্গত যবের শিষ দেখতে কেমন, না, যেন ডানাছেঁড়া প্রজাপতি। কিন্তু যথার্থ প্রতিভাসম্পন্ন এক কবি বললেন, শিষটি দেখে মনে হচ্ছে, দুখানা ডানা হলেই ও প্রজাপতির মত উড়ে যাবে। একই উপমা, কিন্তু দেখবার ভঙ্গীতে আর বলবার কৌশলে কী অসীম তফাত। ছিল প্রাণহীন, হ'ল জীবন্ত।

প্রকৃতির দুটো ধারা আছে। একটাতে দেখি রূপের সঙ্গে রূপের অমিল, ফলে বৈচিত্র্য। এ হ'ল স্থূল। আর-একটাতে দেখি এই সমস্ত গরমিল বা বিচিত্রতা যে অন্তর্নিহিত নিয়ম থেকে নিয়ত উদ্ভূত হচ্ছে তার ঐক্য। বৈসাদৃশ্যের ও বৈচিত্র্যের অন্তরে ঐক্য, এই হল প্রকৃতি—বিশ্বপ্রকৃতিও বটে আর তার ভিতরের মানবপ্রকৃতিও বটে।

প্রথমে আকৃষ্ট হয় শিল্পী বাইরের রূপে। তার পর রূপের সঙ্গে রূপের সম্পর্কে। তার পর যে ভাব ও যে রস প্রত্যেক রূপকে প্রত্যেক মুহূর্তে রূপায়িত ও সঞ্জীবিত ক'রে চলেছে সেই জিনিসটিতে। এই ভাবে শিল্পী যত এগিয়ে যায় ততই তার সৃষ্টিক্ষমতা বাড়ে, ততই ক্রমপ্রসারিত হয় তার সৃষ্টিক্ষেত্র।

বিশেষ শিল্পের বিশেষ ভাষা বা কন্‌ভেন্‌শন (convention) জিনিসটা বিষয়কে সহজ করা নয়, সম্পূর্ণ করা। জ্ঞানের ও সাধনার বিশেষ পরিণতি থেকেই তার উদ্ভব। সর্বত্র যে নিখুঁত ভাব আর নিখুঁত রূপের দিকে উন্মুখ হয়ে

চলেছে প্রকৃতির সকল আবেগ ও ইচ্ছা, অথচ ঝড় রৌদ্র শিলাবৃষ্টি আছে—কীট পশু মানবের শত উপদ্রব আছে—জড় উপাদানের জড়ত্বের বাধা আছে—তাই ঠিকমতো পৌঁচচ্ছে না—দৃষ্টি দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, সেইটিকেই দেখা ও দেখানোতে তার সার্থকতা।

চীনা চিত্রকলা এবং ভারতীয় ভাস্কর্যের তুলনা নেই। কারণ, ভারতীয়েরা বিষয়কে চারি দিক থেকে (in the round) দেখেছে, আর সে দেখা প্রকাশ করবার ঠিক ক্ষেত্র হল ভাস্কর্য, স্থাপত্য। কিন্তু, চিত্রের জমি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এই দুই আয়তনের, তাতে বিশেষ দ্রষ্টব্য হল দূরত্ব বা স্পেস্ ; এই দুই আয়তনের ক্ষেত্রে দূরত্বের রসসৃষ্টি চীনাদের নিসর্গদৃশ্যের চিত্রে যেমন সম্ভব হয়েছে অন্যত্র তা কেমন করে হবে ? চীনাদের ছবি-আঁকা তাদের লেখারই মতো। সেজন্যও চিত্রের সমতল ক্ষেত্র তাদের সৃষ্টির পক্ষে খুব অনুকূল হয়েছে।

ওকাকুরা বলেছিলেন : স্বভাব (Nature), পরম্পরা (Tradition) ও স্বকীয়তা (Originality) এই তিন নিয়ে হয় সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ আর্ট। স্বভাবজ্ঞান না থাকলে আর্ট হয় দুর্বল ও কৃত্রিম। ঐতিহ্যে অধিকার না থাকলে হয় স্থাণু ও কাঁচা। আর, শিল্পীর নিজস্ব দান যদি কিছু না থাকে তবে অন্য সব থাকলেও শিল্পী ঠিক প্রাণ পায় না। অপর পক্ষে, শুধু স্বভাবসম্মত হ'লে হয় নকল ; শুধু পরম্পরায় দখল থাকলে হয় কারিগরি ; আর, শুধু মৌলিকতাটুকু সম্বল ক'রে মানুষ উন্মাদের মতো আচরণ করে।

বিভিন্ন বয়সে মানুষের জীবন বিভিন্ন বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে চলে। শৈশবে মা ; কৈশোরে বন্ধুবান্ধব ; যৌবনে স্ত্রী বা প্রেয়সী ; পরিণত বয়সে আর-কিছু। সেই কেন্দ্রটি থাকলে জীবনের স্বাদ থাকে, সুখ থাকে, উৎসাহ থাকে। কেন্দ্রটি হারালে সবই হয় বিস্বাদ ; তাই কাজেরও কোনো প্রেরণা থাকে না। কাজেই

যে যত স্থায়ী জিনিসকে কেন্দ্র ক'রে জীবন গড়ে তার জীবনের সুখশান্তি ও কর্মের প্রেরণা তত অফুরন্ত হয়। এরকম স্থায়ী জিনিস বলা চলে—এই বিশ্বপ্রকৃতি। এ কথা জীবনেও সত্য, শিল্পেও সত্য।

নিত্যনিয়মিত সাধনার ফলে অবশেষে মনটি হবে পরিপূর্ণ কলসের মতো। পরিপূর্ণ কলস একটু হেলিয়ে দিলেই যেমন জল ছল্‌কে পড়ে তেমনি কোনো কারণে মন একটু নাড়া পেলেই মনের অক্ষয় রসানুভূতি রূপানুভূতি ছল্‌কে পড়ে হবে—ছবি, মূর্তি, নৃত্য, কবিতা, গান।

অনেক আশা নিয়ে, উদ্যম নিয়ে আরম্ভ করে আজ ভাবছ, কিছুই হল না। কিন্তু, আসলে হয়তো হবার আর দেরি নেই। ধরো, তুমি পুরীর মন্দিরে চলেছ। সকালবেলা অনেক দূরে দেখতে পেলে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে মন্দিরের চূড়া। উৎসাহের সঙ্গে হাঁটতে লাগলে। যত বেলা হল রৌদ্র আর বালির উত্তাপ বাড়তে লাগল, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হলে, কখন্ মন্দিরের চূড়াও নিকটবর্তী লোকালয়ের বাড়িঘর গাছপালায় ঢাকা পড়ল। একেবারে দিশা হারালে। চৌমাথায় প'ড়ে কোন্ দিকে যে যাবে বুঝতে পারলে না। তবু হয়তো প্রত্যেক পদে একটু একটু এগিয়েই এসেছ তুমি; যখন একেবারেই হতাশ হয়েছ তখন রাস্তার আর-একটা বাঁক পেরুলেই বা সম্মুখের আর-একটা গাছ ছাড়ালেই দেখবে একেবারে মন্দিরের খোলা দরোজা।

শিল্পীকে সদা সচেতন হতে হবে। ভাগীরথীতে মৃণাল-সমেত পদ্মফুল পদ্মপাতা ভেসে যাচ্ছে ঢেউয়ের তালে তালে উঠে পড়ে। মাছও খেলা করছে সেই জলে; ইচ্ছামতো অনুকূলে বা প্রতিকূলে যাচ্ছে স্রোতের। দুয়ের প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ হল সাধারণ মানুষে আর শিল্পীতে।

২

রিয়েলিটি কী, কুমারস্বামী একটি সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন। যেখানে অভাববোধ থাকে না। অর্থাৎ, আর্টের ক্ষেত্রে বলা যায়, চিত্রে এবং চিত্রের বিষয়বস্তুতে মিল না থাকলেও যখন অভাববোধ হয় না।

চীনেরাও এই কথাই বলেছেন। পাকা আর্টিস্টের কাজ কেমন? না, আশ্চর্যভাবে বস্তুর প্রতীতি হয় অথচ কাছে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, কালীর পোঁচ, তুলির ছাপ, তা ছাড়া কিছুই নয়।

চীনেরা এইজন্যেই বলেন, টেক্‌নিক্‌ই সব আর টেক্‌নিক্‌ কিছুই নয়। মনই আঁকে। মন যখন যেতে চায় তখন টেনে-হিঁচড়ে কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে যায় তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। পাকা আর্টিস্টের টেক্‌নিক্‌ বা ঠিক টেক্‌নিক্‌ হল, তন্ত্রের একটি শ্লোকে যেমন বলেছে, পাখির ওড়ার মতো, এক গাছ থেকে আর-এক গাছে গিয়ে বসল—বাতাসে পথের কোনো চিহ্ন রইল না।

কারও কারও এইটি হয়েছে, যে জিনিসই আঁকুন তাতে প্রবেশ করতে পারেন। প্রবেশ করা কিরকম? তোমার হাত ধরে এইখানে এইভাবে রেখে দিলাম, আবার তুলে নিয়ে অন্য স্থানে অন্য ভঙ্গীতে রাখা গেল, তোমায় ধ'রে ওঠালাম বা বসালাম, এই এক। আর-এক হল, তোমার ভিতরেই যদি আমি প্রবেশ করতে পারি তা হলে তোমার হাত নিয়ে, পা নিয়ে, আমি যা খুশি করতে পারি—উঠতে বসতে দৌড়তে নাচতে কিছুতেই কোনো আয়াস লাগে না, বাধা হয় না; সেটা সহজও হয়, সত্যও হয়।

ছোটো ছেলের আঁকা ছবিও খুব সুন্দর হয়; আশ্চর্য ছন্দ আশ্চর্য রঙ তাতে থাকে। তবুও ছোটো ছেলের কাজের নকল করে আর্টিস্ট্‌ হওয়া যায় না। ছোটো ছেলের কাজের গুণ বড় আর্টিস্টের কাজে আসে, যখন তিনি 'জ্ঞানে'র

চরমে পৌঁছোন। কারণ, বড় মানুষ ছোটো ছেলের অনুকরণ করলে হয় ন্যাকামি, অথচ বড় মানুষও ছোটো ছেলে হয়ে থাকে জানি—তাঁকেই আমরা বলি প্রতিভাবান বা পরমহংস।

এক জাপানি কবিতায় কবি বলছেন, তাঁর চেরীফুল হতে ইচ্ছা হয়। মানুষ তো চেরীফুলের চেয়ে অনেক বড়, অনেক মহান, তবে এরকম বিপরীত ইচ্ছা কেন? তার মানে আছে। মানুষ মানুষ ব'লেই এমন ইচ্ছা তার হয়েছে, চেরীফুলের ইচ্ছা হয় না মানুষ বা আর কিছু হতে। বিচিত্র দিকে বিচিত্র লক্ষ্যে ধী ও অনুভূতি প্রসারিত হয় মানুষের; মানুষের চেতনা জগতের সর্বত্রই প্রবেশ করতে চায়। আর-এক অর্থ এই ধরা যেতে পারে, মানুষ মানুষই থাকতে চায় অথচ চেরীফুলও হতে চায়—মানুষের সত্তার যে অনন্ত জটিলতা, অশেষ মিশ্রণ, অপরিসীম ঐশ্বর্য, সব নিয়েই সবকে জয় ক'রেই, ফোটা চেরীফুলের সহজ শোভা সে পেতে চায়।

ভারতীয় ভাস্কর্য অনেক বড় জিনিস। ওতে যা করেছে আর-কোনো দেশে আর-কোনো যুগে তা করে নি। একটা নটরাজমূর্তি, একটা বুদ্ধমূর্তি বা ত্রিমূর্তি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সংস্কৃতির জগতে ভারতবাসী মাথা উঁচু করে থাকতে পারে—ভারতশিল্প বা ভারতীয় সভ্যতা এরই মধ্যে সম্পূর্ণ আছে। ওতে বিমূর্ত আইডিয়াকে মূর্তি দিয়েছে। স্বভাবের এটা-সেটার নানারকম প্রতিরূপ অনেকে অনেক দিয়েছে। কিন্তু, একটা করুণা বা মৈত্রী বা অন্য কোনো আইডিয়ার মূর্তি সমস্ত শিল্পজগতে দুর্লভ। চিহ্ন বা প্রতীক রচনা করেনি, প্রতিমা সৃষ্টি করেছে; অর্থাৎ, আইডিয়ার 'বাচন' ওখানে কষ্টকৃত বা কল্পনাকৃত নয়, রসিকের কাছে তার বোধ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নয়। আইডিয়াই জন্ম নিয়েছে, আইডিয়াই মূর্তি হয়েছে।

এক সময় য়ুরোপ স্বভাবের হুবহু নকল করার দিকে ঝুঁকেছিল। সেটা আর্টের ঠিক রাস্তা নয়, তাতে শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি দিতে পারে না। প্রতিক্রিয়ার বশে এখন স্বভাবকে একেবারে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে; সেটাও অস্বাভাবিক; তাতে কোনো রস নেই। সমস্ত অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে মানুষ ভাবতেও পারে না, দেখতেও পারে না। বিজ্ঞানের বা মনস্তত্ত্বের তথ্য নিয়ে কী হবে? সেটাই যে আর্টের সত্য তা নয়।…আর্টের বিষয় আর আর্টিস্টের মন, ঠিক যেন বস্তু আর আলো। সূর্যের আলো মাটি পাথরে শুষে নেয়, সেই হল স্বভাবের অনুকারী আর্ট। কাঁচে আয়নায় জলে প্রতিফলিত করে, সেই হল ভারতীয় বা প্রাচ্য শিল্পের জাত। এ আর্ট খুব ক'রে অনুকরণ করতে যায় নি, খুব বেশি অ্যাব্‌সট্র্যাক্ট বা অনুষঙ্গভীরু হবারও তার দরকার নেই। এর যা সত্য তা রূপ ও অরূপ দুই মিলিয়ে দুয়ের মাঝামাঝি বিরাজ করছে।

নিসর্গচিত্রে বা ল্যাণ্ড্‌স্কেপে যে রস তা নব রসের কোনোটা নয়। বড়-জোর শান্তরস বলতে পার বা একাত্মতার রস। চীনেরা, মনে হয়, ওদের ঋষি লাওৎসের বাণী থেকে তা পেয়েছিল।

একটা ভূদৃশ্যের মধ্যে একজন মানুষ। ভূচিত্রটিই বিশেষ ক'রে আঁকবার উদ্দেশ্য থাকলে, মানুষটি আঁকতে চেষ্টা করা উচিত। মানুষটি আঁকাই যদি লক্ষ্য হয় তবে ভূচিত্রটি এঁকে তুলতে যত্ন করা ভালো। ছবির বিষয়কে সামনাসামনি বা হঠকারিতার সঙ্গে আয়ত্ত করতে গেলে তা এড়িয়ে যায়। প্রেমেরও যেমন রীতি, তাতে বাঁকা ভঙ্গী আছে। যে দিকে যেতে চাও সে দিকে সোজা যাও না, যা বলতে চাও তা সোজাসুজি বল না, যা চাও তা ব্যঞ্জনায় সুন্দর ক'রে প্রকাশ করো—ইঙ্গিতে ইশারায়। তাতেই প্রেমিক আর প্রিয়া দুজনেই খুশি হয়, প্রেম সফল হয়। আর্টই বলো আর প্রিয়াই বলো, তার সম্পর্কে হঠকারিতা ভালো নয়—'না চাইলে'ই তাকে পাওয়া যায়।

ভূদৃশ্যের ছবিখানি কেবল গাছপালা, বালির চর, জলের ধারা এঁকে হয়তো সম্পূর্ণ মনের মতন হল না—তখন একটা কোথাও একটি ল্যাজঝোলা ফিঙে, কি পাঁচনি হাতে রাখাল, কি উপুড় হয়ে একটা বাঁদর জল খাচ্ছে, এইটে এঁকে দিতে হল ; অমনি দেখা গেল, সমস্ত নড়ে-চড়ে কথা কয়ে উঠল। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের পরিচয়। উদাস বা সুন্দর ভূদৃশ্যের মাঝখানে, ঐ ফিঙে পাখিটি কি ঐ রাখাল ছেলেটি হল আর্টিস্ট স্বয়ং।

শিল্পে যে সিদ্ধ হয়েছে তার ভুল হয় না। গল্পে শোনা যায় : চীনা শিল্পীর পা লেগে কালীর বাটি উলটে গেল, তৎক্ষণাৎ হাত বুলিয়ে এঁকে দিল আশ্চর্য এক ড্র্যাগন।

আঁকিয়ের মনেতে আঁকবার বিষয়টি ঠিক-ঠিক যখন আছে তখন মন থেকে তুলে কাগজে রেখে দিলেই যেন হল। কিম্বা পর্দা সরিয়ে দিতেই যেন দেখা গেল কী আছে। এ জন্য যে হাত হাতিয়ার কাল এবং কলাকৌশলের প্রয়োজন তা থেকেও নেই ; কারণ, শিল্পীর এবং শিল্পরসিকের তার সম্বন্ধে কোনো হুঁশই নেই যেন।

তীর ধনুক নিয়ে অনেক নিশানা ক'রে, অনেক যত্ন ক'রে, লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করা যেতে পারে ; তাতে লক্ষ্য বিদ্ধ হতে পারে, না হতেও পারে। আর-এক, যখন লক্ষ্যই তীরকে আকর্ষণ করে নেয় চুম্বকের মতো, কোনো চেষ্টা নেই ব'লেই ভ্রান্তি বা চ্যুতির কোনো সম্ভাবনা নেই।

বর্তমান যুগে এবং বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্ত্য দেশে বিজ্ঞানের প্রভাব শিল্পের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে। কতকটা তারই ফলে 'অবচেতন' মনের বা 'অতি-সচেতন' মননের দ্বারা একপ্রকার শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। সেরকম কাজ দেখে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, যা কেবল কৌতূহল জাগায়, হেঁয়ালি অথবা প্রব্লেমের আকার নেয়, তাও শিল্প কি না। আমাদের ধারণা, শিল্প রসের

ব্যঞ্জনায় এক দিকে যেমন অনির্বচনীয় ও অপরিসীম আর-এক দিকে তেমনি রূপে রেখায় অর্থে সুসীম, সংহত ও সুনির্দিষ্ট। কারণ, শিল্প হচ্ছে মানুষের সত্তার সঙ্গে বিশ্বসত্তার একান্ত পরিচয়ের সাক্ষ্য বা প্রতীক। এও বলা যেতে পারে, শিল্প নতুন পরিচয় সৃষ্টি ক'রে এক সৃষ্টির জিনিসকে আর-এক সৃষ্টিতে উত্তীর্ণ করে দেয়।

কোনো একটি মেয়ের কথা ধরো। সংসারে সে কারও মেয়ে, কারও স্ত্রী, কারও সখী, কারও মা। প্রকৃতির মধ্যে ও প্রকৃতির চোখে সে মা নয়, মেয়ে নয়, পত্নী নয়, কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধেই কারো সঙ্গে বাঁধা নয়—সে নারীমাত্র। আবার ঐ মেয়েরই এমন পরিচয় পেতে পারি যে, ও হল মা, ওর কোলে ছেলে আছে বা এমন কোনো সুপরিস্ফুট লক্ষণ আছে যাতে অন্য কোনোরকম কল্পনাও করা যায় না। মেয়েটির প্রকৃতির মধ্যেও যেমন, কারও অন্তরঙ্গ অনুভূতির মধ্যেও তেমনি, নিঃসন্দিগ্ধ ও নির্দিষ্ট একটা পরিচয় পাওয়া যায়—আর তখনই সে শিল্পের বিষয় হয়ে ওঠে। সংসারে তার নানা পরিচয় প্রতি মুহূর্তে একটা আর-একটাকে ঝাপসা ক'রে দেয়, তার প্রকাশকে অনুজ্জ্বল করে এবং তাকে ভালো করে চেনা হয় না ব'লেই সে বোধের বিষয় ও শিল্পের বিষয় হ'য়ে উঠতে পারে না।…যে মেয়েকে রোজ দেখি তাকে দেখি নে। বিয়ের আসরে সে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন দেখি, সে অপূর্ব, সে অনন্য।

একখণ্ড পাথরের কথাই ধরা যাক্। যখন তা পাথর ছাড়া আর-কিছু নয় তখন তা প্রাকৃতিক বস্তু মাত্র, ভূবিজ্ঞানের বা বস্তুবিজ্ঞানের এলেকাভুক্ত, চোখে দেখার বা যন্ত্রে পরীক্ষা করার বিষয়। আবার, সেই পাথরের টুকরো এমনও হতে পারে বা এমনভাবে কেউ তাকে আংশিক রচনা করতে পারে যাতে তাকে একবার মনে হয় শিব, একবার মনে হয় বানর, একবার মনে হয় জটাই বুড়ি। তখনও তা কৌতূহল জাগালো, জিজ্ঞাসা জাগালো, রস জাগালো না। কারণ, কোনো-একটা বিশেষ পরিচয় ধ'রে তাকে আত্মীয় ব'লে

জানলেম না, তাকে নাম ধ'রে ডাকলেম না। শিল্পীর হাতে যখন পড়ল তখন পাথর আর পাথর রইল না। শিল্পী আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, অনুভব দিয়ে, যা দেখলেন বা যে দেখার আরোপ করলেন, তাতে ঐ পাথর হয় শিব, নয় বানর, নয় জটাই বুড়ি, অনন্য একটা কোনো পরিচয়ে রসিকের কাছে পরিচিত হল, রসিকের অন্তরঙ্গ হল এবং শিল্প পদবাচ্য হল। তখনই তা সৃষ্টির প্রতিসৃষ্টি হল।

পুব দিকে সবুজ বনের মাথায় কাজলকালো মেঘ, আমার এত ভালো লাগছে কেন, মনকে এমন করে নাড়া দিচ্ছে? কারণ আর কিছু নয়—একই সত্তার, একই চেতনার, এক প্রান্ত হল ঐ মেঘ আর অন্য প্রান্ত হল এই আমি।

এক দিকে মেঘ, আর-এক দিকে আমি; তাই মেঘের সুখ আমাতে অথবা আমার দুঃখ মেঘে সঞ্চারিত হচ্ছে। একই সত্তা বিষয় ও বিষয়ী। আমার ইন্দ্রিয়গুলি দরজা জানলা মাত্র। সেই পথে আমি ও আমার বিষয় মিলছে, মিশছে; একই চেতনায় নানারকম দোলা লাগছে, ঢেউ জাগছে।

কুণালজাতকে আছে কামলোকের কথা—তার উপরে রূপলোক, তারও উপরে অরূপলোক। আমি বলি তারও উপরে আনন্দলোক। কামলোকে আসক্তি, তাই অন্ধতা। রূপলোকে উঠে রূপ গোচরীভূত হয়েছে। অরূপলোকে পৌঁছে প্রাণে নিখিল প্রাণের ছন্দস্পন্দ অনুভব করা গেছে। আনন্দলোকে রস। শাস্ত্রেই বলেছে, রসো বৈ সঃ।

—

শিক্ষায় শিল্পের স্থান : ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্‌যাপিত শিক্ষাসপ্তাহে নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ -এর বঙ্গীয় শাখার অধিবেশনে পঠিত।

শিল্পসাধনা : মায়াবতী অদ্বৈত-আশ্রমের পবিত্রানন্দ স্বামীজি গ্রন্থকারের সহিত কোনো-একটি আলাপ আলোচনার ইংরেজি অনুলেখন লিপিবদ্ধ ও প্রবুদ্ধভারত পত্রিকায় প্রকাশিত করেন, তদবলম্বনে রচিত।

শিল্পপ্রসঙ্গ : দার্জিলিঙ রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-আশ্রমের প্রবুদ্ধানন্দ স্বামীজি গ্রন্থকারকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন এবং প্রশ্নোত্তর ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রবুদ্ধভারত পত্রিকায় প্রকাশিত করেন, তদবলম্বনে রচিত।

শিল্পসংগতি : শ্রীমান্ পরিমল সরকারকে লিখিত পত্রের অংশ।

শিল্পদৃষ্টি : মৌখিক উক্তির অনুলেখন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্য উক্ত। শ্রীমান্ কানাই সামন্ত কর্তৃক সংকলিত ও গ্রন্থকার কর্তৃক সংশোধিত।

অধিকাংশ রচনা বিভিন্ন সময়ে—বিচিত্রা, প্রবাসী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, দেশ ও শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।